ইউনিট ৫: বিদ্যালয়ে কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও বিশেষ ব্যবহার

ভূমিকা

বর্তমানে মানব জীবনের প্রায় সকল কাজেই কম্পিউটারের ব্যবহৃত হচ্ছে। চিত্তবিনোদন থেকে শুরু করে শিক্ষা, বিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য সর্বত্রই কম্পিউটারের ব্যবহার যেন একটি সাধারণ অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার্য এ যন্ত্রটিকে সর্বদা ব্যবহার উপযোগী করে রাখতে হলে প্রয়োজন নিয়মিত ও যথোপযুক্ত পরিচর্যার, নইলে এ যন্ত্রটি অর্থাৎ কম্পিউটারটি বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে কম্পিউটার ব্যবহার করতে হলে জানা থাকা দরকার কিভাবে কম্পিউটারকে সব সময় সচল ও কার্যক্ষম অবস্থায় রাখা যায়। একজন শিক্ষক শ্রেণিতে কম্পিউটার ব্যবহার করে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে থাকেন। তাছাড়া শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার জন্য এবং শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করার জন্য বিভিন্ন প্রকার কম্পিউটারের সহায়তায় শিখন (Computer Assisted Learning)-এর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার শিখন শেখানো কার্যক্রমে যেমন কম্পিউটারের ব্যবহৃত হচ্ছে তেমনি শিক্ষা প্রশাসনের সকল কার্যক্রম মানসম্মত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা জন্য শিক্ষা প্রশাসনেও কম্পিউটারের ব্যবহার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল কারণে একজন শিক্ষকের কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ, কম্পিউটারের সহায়তায় শিখন ও শিক্ষা প্রশাসনে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ ইউনিটে নিম্নলিখিত পাঠসমূহ আলোচনা করা হল–

পাঠ ৫.১ : কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের মৌলিক বিষয়াদি
পাঠ ৫.২ : কম্পিউটার সহায়তায় শিখন (Computer Assisted Learning)
পাঠ ৫.৩ : প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যার/ডিজিটাল কন্টেন্ট-এর ব্যবহার: শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল কন্টেন্ট
পাঠ ৫.৪ : শিক্ষার্থীদের শিখন কাজে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ এবং ট্যাবস
পাঠ ৫.৫ : তথ্যভান্ডার ভিত্তিক শিক্ষা প্রশাসন

পাঠ ৫.১: কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের মৌলিক বিষয়াদি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কম্পিউটারের জন্য ক্ষতিকারক দিকগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত কম্পিউটারের যত্নআত্তির নিয়মকানুন বর্ণনা করতে পারবেন।

বিশ্বায়নের এ যুগে চিত্তবিনোদন থেকে শুরু করে শিক্ষা, বিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য সর্বত্রই কম্পিউটারের ব্যবহার অপরিহার্য। নিত্যদিনের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গে পরিণত হওয়া এ যন্ত্রটিকে নিয়মিত যথোপযুক্ত তদারকির মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করে রাখতে হয়, নইলে অচিরেই যন্ত্র বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে কম্পিউটার ব্যবহার করতে গেলে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হওয়া অত্যাবশ্যক নয়, কেবল জানা থাকা দরকার কিছু নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া যা অবলম্বনের মাধ্যমে কম্পিউটারকে অধিকতর সচল ও কার্যক্ষম অবস্থায় রাখা যায়। উপযুক্ত যত্ন নিলে কম্পিউটার দ্রুত ও সঠিকভাবে কাজ করে, সহজে হ্যাং হয় না বা ক্যাস করে কম।

ক্ষতির কারণসমূহ

আমাদের যেসব অবহেলা বা অজ্ঞতার কারণে কম্পিউটার প্রায়শই ধীরগতিতে কাজ করে বা হ্যাং হয়ে যায় সেগুলো নিম্নরূপ:

১. অতিরিক্ত তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, ধুলিকণা, চৌম্বকক্ষেত্র, তরল ও দাহ্য পদার্থ ইত্যাদি ক্ষতিকারক পরিবেশগত ও কৃত্রিম উপাদানের সংস্পর্শে আসা;
২. বেখেয়ালিভাবে কম্পিউটারের তার ধরে অযথা টানাহেঁচড়া করা এবং তাড়াহুড়ো করে ও বলপূর্বক কীবোর্ড, মাউস, পেনড্রাইভ, সিডি ইত্যাদি ব্যবহার করা;
৩. অপ্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার, ফাইল, ই-মেইল ইত্যাদি দ্বারা সিস্টেম ওভারলোড করে ফেলা;
৪. ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার চালু অবস্থায় একই সাথে অনেকগুলো ট্যাব বা টুল বার খুলে রাখা এবং
৫. রিসাইকেল বিনে জমা হওয়া আইটেম, জাঙ্ক ই-মেইল ইত্যাদি পুরোপুরিভাবে ডিলিট না করা।

জেনে রাখা ভাল

BIOS (Basic Input/Output System): এটি একটি বিশেষ ধরনের সফ্টওয়্যার যা কম্পিউটারের মাদারবোর্ডের ফ্ল্যাশ মেমোরি চিপে সংরক্ষিত থাকে। এটির কাজ মূলত বেসিক হার্ডওয়্যারের ফাংশনকে নিয়ন্ত্রণ করা। কম্পিউটারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে BIOS সেটিং এ শক্তিশালী পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখা জরুরি।

জেনে নেয়া যাক কম্পিউটার দেখভালে করণীয় কী:

১. **উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করুন:** কম্পিউটারটিকে ধুলাবালিমুক্ত এমন কোন পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখুন যেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা আছে। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ এবং সরাসরি সূর্যের আলো ও তাপ প্রবেশ করে এমন স্থান থেকে কম্পিউটারকে দূরে রাখুন। কম্পিউটারের তার, সুইচ ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ যথাসম্ভব শিশু ও গৃহপালিত পশু-পাখির নাগালের বাইরে রাখুন।
২. **অপ্রয়োজনীয় ফাইল, অ্যানিমেশন ও ভিজ্যুয়াল এফেক্ট দূর করুন:** কম্পিউটারে জমা হওয়া অপ্রয়োজনীয় ফাইল, আকর্ষণীয় অ্যানিমেশন ইত্যাদি কাজের গতি কমিয়ে দেয়। এ গতি ঠিক করতে পারে ক্লিনআপ

প্রোগ্রাম। এক্ষেত্রে "Cleaner" অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করা যেতে পারে। পাশাপাশি, অপ্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যারগুলো আনইন্সটল করে দিন। প্রয়োজনবোধে অপারেটিং সিস্টেম রিইনস্টল করুন।

৩. **আপডেটেড অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করুন:** কম্পিউটারে অ্যান্টিভাইরাসের সর্বাধুনিক ভার্সন ব্যবহার করুন ও নিয়মিত আপডেট করুন। এরপর নিয়মিত ভাইরাস চেকিং, স্ক্যানিং চালু রাখুন। অন্যথায় ভাইরাসের কারণে কম্পিউটারের গতি কমে যেতে পারে।

৪. **বাড়তি Ram লাগান:** অল্প খরচে কম্পিউটারের গতি বাড়ানোর একটি উপায় হলো বাড়তি Ram যোগ করা। এতে প্রায় সব কম্পিউটারের গতিই বেড়ে যায়।

৫. **সলিড স্টেট হার্ড ড্রাইভ চালান:** হার্ড ড্রাইভের গতির কারণে কম্পিউটারের গতি কমে যেতে পারে। এ সমস্যার সমাধানে কম্পিউটারে সাধারণ হার্ড ড্রাইভের বদলে ব্যবহার করুন সলিড স্টেট হার্ড ড্রাইভ। এটি কম্পিউটার চালু হওয়ার গতিও বাড়াবে। নিয়মিত হার্ড ডিস্ক এরর চেকিং চালু রাখুন।

৬. **স্টার্ট আপ সফটওয়্যার কমান:** কম্পিউটার স্টার্ট করার সময় যেসব সফ্টওয়্যার চালু হয় সেগুলো লক্ষ্য করুন। এখানে বেশি সফ্টওয়্যার থাকলে তা কম্পিউটারের গতি কমিয়ে দেবে। এজন্য স্টার্ট মেনু থেকে "Msconfig" টাইপ করুন। এরপর "Startup"-এ যান। এখানেই কম্পিউটার চালুর সময়কার সফ্টওয়্যারগুলো পাবেন। তবে এখান থেকে যে কোন কিছু ডিলিট করার আগে ভালোভাবে জেনে নিন। অন্যথায় তা কম্পিউটারের সমস্যা তৈরি করতে পারে।

দরকারি তথ্যাদি বা ফাইলগুলো ব্যাকআপ সিডি বা ড্রাইভে সংরক্ষণ করা উচিত। কম্পিউটার থেকে হারিয়ে যাওয়া ফাইল পুনরুদ্ধার করতে বা বিভিন্ন যান্ত্রিক ত্রুটি (ডিস্ক এরর, ফাইল অ্যালোকেশন এরর, ক্লাস্টার চেইন, ব্যাড সেক্টর) চিহ্নিত করতে নরটন ডিস্ক, মেকঅ্যাপি, পিসি টুলস প্রভৃতি ডায়াগনস্টিক সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. **ক্লিন উইন্ডোজ ইনস্টল করুন:** কম্পিউটারে যদি অসংখ্য সফ্টওয়্যার ও ভাইরাসের ছড়াছড়ি থাকে তাহলে তার সব সফ্টওয়্যার নতুন করে ইনস্টল করাই ভালো। এজন্য উইন্ডোজের ইনস্টলের সিডি বা ইউএসবি স্টিক সংগ্রহ করুন। এরপর নির্দেশনা অনুযায়ী ইনস্টল করুন। সম্ভব হলে হার্ড ডিস্কের একটি পার্টিশন সম্পূর্ণ ফরম্যাট করে নতুন করে সেখানে উইন্ডোজ ইনস্টল করুন।

৮. **ব্রাউজারের ক্যাশ পরিষ্কার করুন:** আপনার ইন্টারনেট ব্রাউজারে যদি নিয়মিত ওয়েবসাইট ভিজিট করেন তাহলে এর ক্যাশে বহু ফাইল জমা হতে পারে। এ ফাইলগুলো দূর করার জন্য সেটিংস মেনু থেকে হিস্ট্রিতে যান। এরপর ক্লিয়ার হিস্ট্রিতে ক্লিক করুন।

৯. **সার্চ ইনডেক্স রিফ্রেশ করুন:** কম্পিউটারে সংরক্ষিত বিভিন্ন ফাইল দ্রুত সময়ে খুঁজে বের করতে সার্চ ইনডেক্স রিফ্রেশ করা প্রয়োজন। এজন্য উইন্ডোজের ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার নিয়মিত (সাধারণ ব্যবহারে সপ্তাহে একবার) চালাতে হবে। এটি সাধারণত কন্ট্রোল প্যানেলেই সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

১০. **রিস্টার্ট করুন:** কম্পিউটার যদি দীর্ঘক্ষণ একনাগাড়ে চলে তাহলে গতি কমে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সমাধান হলো রিস্টার্ট করা। তবে বিনা দরকারে যখনতখন কম্পিউটার রিস্টার্ট করা বা সরাসরি মেইন সুইচ অফ করা থেকে বিরত থাকুন। যেকোন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে প্রথমে ম্যানুয়ালি শাট ডাউন করুন ও প্রয়োজনবোধে প্রধান বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।

কম্পিউটার অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্র এই অর্থে যে, নিয়মিত ও সুষ্ঠু পরিচর্যার অভাবে এটি কর্মক্ষমতা হারাতে সময় নেয় না। কম্পিউটারের মূল উপাদানগুলোর ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান এবং দুর্বল দিকগুলোর ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ও যত্নশীল থাকলে আপনার কম্পিউটারটি নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন আরো বেশ কিছুদিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অপ্রয়োজনীয় ফাইল দ্বারা কম্পিউটার বোঝাই করে রাখলে কোন সমস্যাটি তৈরি হয়?
ক. হার্ড ডিস্ক এরর
খ. সিস্টেম ওভারহিটিং
গ. ভাইরাস অ্যাটাক
ঘ. সিস্টেম ওভারলোডিং

২. অল্প খরচে কম্পিউটারের গতি বাড়ানোর উপায় কোনটি?
ক. উইন্ডোজ রিইনস্টল করা
খ. বাড়তি Ram লাগানো
গ. অ্যান্টিভাইরাস আপডেট করা
ঘ. ভিজুয়াল এফেক্ট চালু করা

৩. নিচের কোনটি ডায়াগনস্টিক সফটওয়্যার?
ক. হার্ড ডিস্ক
খ. অপটিকাল ডিস্ক
গ. নরটন ডিস্ক
ঘ. ইউটিলিটি ডিস্ক

উত্তরমালা:১। ঘ, ২। খ, ৩। গ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কম্পিউটার ব্যবহারকালে আপনি কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকেন? আলোচ্য পাঠের আলোকে এসব সমস্যার কারণগুলো উল্লেখ করুন।

২. কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণের সাধারণ নিয়মাবলী গুছিয়ে লিখুন।

৩. টীকা লিখুন: BIOS, ডিফ্র্যাগমেন্টেশন।

পাঠ ৫.২: কম্পিউটার সহায়তায় শিখন (Computer Assisted Learning)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কম্পিউটার সহায়তায় শিখন কী বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কম্পিউটারের সহায়তায় শিখন (Computer Assisted Learning)-এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটারের সহায়তায় শিখন (Computer Assisted Learning)-এর ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম বা কোন বিষয়বস্তু সহজ, আকর্ষণীয় ও কার্যকর করতে শিক্ষক বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা উপকরণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহণ করে থাকেন। শিক্ষক বিভিন্ন আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আয়ত্ব করাতে সহায়তা করেন। শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম আকর্ষণীয় ও কার্যকর করা এবং শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ করার লক্ষ্য নিয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কম্পিউটার নির্ভর বা কম্পিউটারের সহায়তায় শিখন (Computer Assisted Learning) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কম্পিউটারের সহায়তায় শিখন (Computer Assisted Learning) হচ্ছে মূলত অফ-লাইন ও অনলাইন উভয়ভাবে ব্যবহারযোগ্য এক বিশেষ প্রকৃতির কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা করা স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিখন সামগ্রী হিসেবে কাজ করে। এ সকল শিখন সামগ্রীকে সংক্ষেপে (CAL) বলা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থী নিজের সময় ও সুযোগ মতো CAL-এর সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিখন অনুশীলন করতে পারে। কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী শিখনের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম।

CAL-কম্পিউটার নির্ভর বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা গেম এর এমন একটি সমন্বয় যাবারবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিখন অভ্যাস অব্যাহত রাখা যায়। এরূপ স্ব-শিখন কম্পিউটার প্রোগ্রাম বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে যেমন– চর্চা ও অনুশীলন (Drill &Practice), কম্পিউটার নির্ভর গেম (Games), সিমুলেসন (Simulation), টিউটোরিয়াল (Tutorials) কম্পিউটার শিক্ষার্থীর যোগাযোগের (Interaction) ভিত্তিতে এর দ্বারা শিখন চলতে থাকে। কম্পিউটার সহায়ক শিখনের বা Computer Assisted Learning (CAL) মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং শ্রেণি কার্যক্রমে তা ব্যবহারের উপর বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

CAL-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

- CAL-এর ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অনেকটা গৌণ হয়ে থাকে, শিক্ষক এক্ষেত্রে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করেন; এক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা পরোক্ষমূলক ধরনের হয়ে থাকে;
- এটি Interactive Instructional কৌশল, অর্থাৎ কম্পিউটার-শিক্ষার্থীর যোগাযোগের বা সাড়া প্রদানের (Interaction) ভিত্তিতে এর কাজ চলতে থাকে;
- এক্ষেত্রে রিসোর্স হল প্রযুক্তি, শিক্ষক এবং কম্পিউটার;
- লেখা, ছবি, শব্দ ও ভিডিও-র সংমিশ্রণে হয়ে থাকে;
- এ ধরনের শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমতত্ত্বমূলক এবং জীবন ঘনিষ্ঠ উদাহরণ এর সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে;
- এখানে ব্যবহারিক ভাবে বা হাতে-কলমে শিখন-শিক্ষণ কার্যকলাপ করানোর সুযোগ থাকে;
- কম্পিউটার নির্ভর শিখনে (CAL)-এর ক্ষেত্রে সিমুলেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে;
- সুনির্দিষ্ট শ্রেণি ও বিষয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে।

CAL-এর উপাদানসমূহ

- টেক্সট ও মাল্টিমিডিয়া নির্ভর বিষয়বস্তু (Text or Multimedia Content)
- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা (Multiple Choice Questions)
- সমস্যা (Problems)
- তাৎক্ষণিক ফলাবর্তন (Immediate Feedback)
- ভুল উত্তরের জন্য মন্তব্যসহ নোট (Notes on Incorrect)
- তাৎক্ষণিক সাড়াপ্রদান (Summarizes Students' Performance)
- প্র্যাকটিস করার মতো অনুশীলন (Exercises for Practice)
- ওয়ার্কশীট ও টেস্ট (Worksheets and Tests)

CAL-এর মূল ফোকাস বা উদ্দেশ্য

CAL শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও স্ব-শিক্ষণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার উপযোগী ও কার্যকর। এসব উপকরণ শিক্ষকদের পাঠদান দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষার্থীদের জন্য জটিল বিষয়কে সহজে বোধগম্য করতে সহায়তা করে। যে সকল উদ্দেশ্যে শিক্ষক CAL ব্যবহার করেন সেগুলো উল্লেখ করা হলো–

- শিখনের ধরন (Learning Pattern) সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী করা।
- নিজের সুবিধামতো সময়ে, শ্রেণিকক্ষে এবং পরবর্তিতে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বারবার চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন করা;
- ফলাবর্তন (Feedback) প্রদানের মাধ্যমে শিখনকে আরও ফলপ্রসূ এবং দীর্ঘস্থায়ী করা;
- শ্রেণিকক্ষকে অংশগ্রহণমূলক ও আরো শিখন সহায়ক করে তোলা;
- পাঠদান অধিকতর আনন্দদায়ক ও মনযোগ-আকর্ষক করা;
- পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করে তোলার মাধ্যমে স্ব-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষকের জন্যও স্ব-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং
- শিখন ও শিক্ষা কার্যক্রমে কম্পিউটার প্রযুক্তির সম্পৃক্তকরণ এবং গ্রামের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রযুক্তিবান্ধবকরণ।

CAL-এর সুবিধা

CAL ভিত্তিক শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সবসময় বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বজায় রাখাহয়। এটির প্রেষণা সৃষ্টি করার ক্ষমতা বেশি। এটি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টিতে সবসময় সচেষ্ট থাকে। ধৈর্যের ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যন্ত্র চালিত হওয়ায় অনুশীলনের সময় বারবার সহায়ক ফলাবর্তন প্রদান করে থাকে। শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী বারবার পুনরাবৃত্তি করে থাকে, যা গতানুগতিক ক্লাসে সবসময় সম্ভব নয়। এ শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থীর সাথে একই প্রকার ও নিরপেক্ষ আচরণ প্রদর্শন করা হয়। কোনরূপ পক্ষপাতিত্বের সুযোগ এখানে নাই। সাধারণ শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার পরিপূরক বলা হয় Drill এবং Practice-কে।

- CAL সবসময় আদর্শ অবস্থা বজায় রাখে। এটি সবসময় সক্রিয় ও সদা প্রস্তুত থাকে। শিক্ষার্থীদের একটি উদাহরণ বুঝতে সমস্যা হলে এটি আরেকটি উদাহরণ প্রদান করে এবং বারবার অনুশীলনের সুযোগ করে দেয়।
- CAL সবসময় শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী শিক্ষা দিয়ে থাকে যা গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষে সম্ভব হয় না।

- CAL ভিত্তিক শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া খুব ভাল হয়।
- CAL উপকরণ শিক্ষার্থীদের রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের নৈপূণ্য বা কৃতিত্ব (Performance) প্রদর্শন করে যেটা গতানুগতিক ক্লাসে সবসময় সম্ভব হয় না।
- CAL ভিত্তিক শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের দ্রুত ফলাবর্তন প্রদান করা হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের অবস্থা জানতে পারে।

ড্রিল ও চর্চা (Practice)

ড্রিল হল মূলত তাত্ত্বিকভাবে জানা জিনিসকে বাস্তবায়ন করা। অন্যভাবে বলা যায় যে ড্রিল হল নতুন করে বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমে জানা বিষয় সম্পর্কে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করা। কম্পিউটার এর মাধ্যমে অথবা কম্পিউটার নির্ভর অন্য কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ড্রিল করা যায়। যেমন– ইংরেজি ব্যাকরণের Tense পড়াবার সময় প্রত্যেকটি Tense-এর সুত্র বা গঠনের প্রয়োগ ড্রিলের মাধ্যমে বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে আরও বেশি দক্ষ করে তোলা যাবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা CAL-এর মাধ্যমে ড্রিল ব্যবহার করে নিজেরা Tense-এ দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

একই জিনিসের বারবার অনুশীলন করাকে চর্চা বা Practice বলে। আবার অন্যভাবে বলা যায় যে চর্চা হল পূর্বে শেখা কোন বিষয়ের বারবার অনুশীলন বা পুনরাবৃত্তি করা। CAL ভিত্তিক বিভিন্ন চর্চা করার সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন লেবেলের শিক্ষার্থীদের জন্য। যেমন– কেউ যদি কম্পিউটার এর টাইপ শিখার জন্য বারবার কম্পিউটার কীবোর্ড ব্যবহার করে টাইপ শিখার চেষ্টা করে থাকে তাহলে উক্ত শিক্ষার্থী এই চর্চার মাধ্যমে টাইপ শিখতে পারবে এবং যত বেশি সে চর্চা করবে ততবেশি সে টাইপিং এ দ্রুততা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের টাইপিং সফ্টওয়্যার রয়েছে যেগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার্থী বারবার চর্চার মাধ্যমে একই সাথে বাংলা, ইংরেজিসহ যে কোন ভাষার টাইপিং শিখতে পারবে এবং দ্রুত টাইপিং করতে সক্ষম হবে।

ড্রিল এবং চর্চার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য

- এ ধরনের CAL উপকরণে সেশন পূর্ব নির্ধারিত থাকে/থাকবে।
- এখানে দলীয় ভাবে কাজ করার চেয়ে মূলত এককভাবে কাজ করার সুযোগ বেশি থাকে।
- উপযুক্ততার মাত্রা অর্থাৎ Level of Appropriate অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ থাকে।

ড্রিল এবং চর্চার সুবিধা

- ধারণকৃত বা বিদ্যমান দক্ষতার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।
- নতুন দক্ষতার উন্নয়নে সাহায্য করে।
- জ্ঞানকে আরও গভীর ও সুন্দর করতে সাহায্য করে।
- বারবার অনুশীলন করার সুযোগ দেয়।
- ব্যবহারিক দিকের উপর গুরুত্বারোপ করে থাকে যার ফলে ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- আউটপুটকে অধিক দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে।

খেলা বা গেমস (Games)

খেলতে খেলতে শেখার কথা বলে গেছেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবার সত্যিকার অর্থেই পড়ালেখা হবে খেলতে খেলতে যেটা সম্ভব পর করেছে CAL।

প্রায়ই CAL সফ্টওয়্যার গেমস ফরমেটে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। কম্পিউটার নির্ভর খেলাধুলা হল কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে উন্নয়ন করার জন্য কিছু মজাদার নির্দেশনার মাধ্যমে উন্নয়ন করা হয়। এটি অনেক বেশি প্রেষণাদায়ক (Motivational)।

উদাহরণ- ১: গেমস এর অন্যতম প্রধান উদাহরণ হল টাইপিং গেমের মাধ্যমে টাইপ শেখা।

উদাহরণ- ২: এ রকম আরেকটি উদাহরণ SimCityEDU: Pollution Challenge. শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী করে সাজানো এই গেমে শিক্ষার্থীদের একটি শহরের মেয়রের ভূমিকা পালন করতে হবে। যে শহরে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার ভূমিকা পালন করবে এবং শহরের নানা বিষয় যেমন পরিবেশদূষণ বা যানজট ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করবে।

বৈশিষ্ট্য

- গেমসে স্কোরিং এবং নম্বরের ব্যাপার থাকে।
- এতে বেশ কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়।
- এটি স্বতন্ত্র বা টিম ফরমেটের হতে পারে।
- এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য পুরষ্কারের (Reward) ব্যবস্থা থাকে।

গেমস ডিজাইনের ধাপ

গেমস ডিজাইনের প্রধান ৪টি ধাপ রয়েছে। যথা–

১. **প্রতিযোগিতা (Competition):** গেমস উন্নয়ন করার সময় প্রতিযোগিতা থাকতে হবে যাতে করে সব শিক্ষার্থীই যেন আগ্রহ পায়।

২. **সহযোগিতা (Co-operation):** শিক্ষার্থী যখন কোন গেমস খেলে তখন তাকে সহযোগিতা করার সুযোগ (Scope) থাকতে হবে। শিক্ষার্থী যে লেবেলের সেই লেবেল অনুযায়ী সাহায্য করার সুযোগ থাকবে। এতে করে শিক্ষার্থীরা মনোবল হারাবে না।

৩. **চ্যালেঞ্জ** (Challenge): যখন শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে ভাল করতে থাকবে তখন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। যাতে করে তারা নতুন উদ্যমে আরও ভাল করার প্রেরণা পায়।

৪. **কল্পনা** (Fantasy): গেমসে কল্পনার ব্যাপার থাকবে। কল্পনার বিভিন্ন বিষয় দেয়া থাকবে যাতে করে শিক্ষার্থীরা মজা পায় এবং উক্ত গেমস খেলার মাধ্যমে নিজেদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করতে পারে।

গেমসের প্রয়োগ

গণিতে যোগ-বিয়োগ শেখানের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয়।

যেমন– ছবি গেমসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে যোগ, বিয়োগ, গুণ শেখানো।

- রং এর সমন্বয়ের (Colour Combination) জন্য গেমস ব্যবহৃত হয়।
- বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।
- গেমসের প্যাটার্ন Recognition-এর মাধ্যমে বায়োম্যাট্রিক পদ্ধতিতে কাজ করা যায়। এর মাধ্যমে সিম (SIM-Subscriber Identity Module) ব্যবহারে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করা যায়।

সিমুলেশন (Simulation)

এটি এক ধরনের CAL উপকরণ যেটা তুলনামূলকভাবে সর্বাপেক্ষা সফল। নবীন শিক্ষার্থীর জন্য অনেক সময় বাস্তব পরিবেশে যাওয়া ও কাজ করার পূর্বে কৃত্রিম পরিবেশে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করা হয় কম্পিউটার নির্ভর কিছু সিমুলেসন প্রোগ্রামের মাধ্যমে। প্লেন চালনার মতো ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয় বহুল প্রশিক্ষণে সিমুলেসনের মাধ্যমে অনেক কিছুই শেখানো সম্ভব। সিমুলেশনের মাধ্যমে শিখন অনেক নিরাপদ। সিমুলেশনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি কঠিন কাজকে সহজ করে তুলে। সিমুলেশন শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছ ধারণা পেতে সাহায্য করে। সিমুলেশনের মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী নিজ ইচ্ছামত Slow এবং Fast করতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষণ ব্যয় তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এটি শিক্ষার্থীদের একটি কৃত্রিম পরিবেশ প্রদান করে থাকে।

সিমুলেশন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য

- শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ দক্ষতাগুলো প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি;
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ দক্ষতার ভুলত্রুটি সংশোধন;
- বাস্তব পরিবেশের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া;
- শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং
- শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করা।

সিমুলেশনের তাৎপর্য

ফলপ্রসূ শিক্ষণের ক্ষেত্রে কৌশল হিসেবে সিমুলেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। সিমুলেশনে অনেক সময় বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ধারণা পায় বলে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে। সিমুলেশনে সামগ্রিকভাবে শিক্ষণ দক্ষতাগুলো প্রয়োগের সুযোগ থাকে বলে পরিপূর্ণ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে অভ্যস্থ হয়ে উঠে। সিমুলেশনের দ্বারা শিক্ষার্থীরা নিরাপদ অবস্থানে থেকে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। সিমুলেশন কৌশল প্রয়োগের সময় শিক্ষক সাহায্যকারী, মূল্যায়নকারী ও উৎসাহদানকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে বলে দিনে দিনে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যকার সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রক্রিয়া সুদৃঢ় হয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সিমুলেশন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠদান কার্যক্রমকে বাস্তবমুখী, জটিলতামুক্ত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিভিন্ন ইতিবাচক দিক থাকার পরও সিমুলেশন কৌশলের কিছু দুর্বল দিকও রয়েছে। যেমন– বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি, কৃত্রিমতায় অভ্যস্ত হওয়া ইত্যাদি। এগুলোর প্রতি সচেতন থাকলে সিমুলেশনের ইতিবাচক দিকগুলো বেশি কার্যকর হবে।

সিমুলেশনের প্রয়োগ

- সিমুলেশনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ হয় বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে;
- বড় কাজকে ছোট কাজে রূপান্তর করার জন্য;
- আইসিটি শিক্ষার ক্ষেত্রে;
- সামাজিক বিজ্ঞানের মহড়ার ক্ষেত্রে এবং
- সিমুলেশনের অন্যতম প্রয়োগ হল উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করার জন্য।

টিউটোরিয়াল (Tutorials)

টিউটোরিয়াল (Tutorials) হল এমন একটি সিস্টেম বা শিক্ষণ ব্যবস্থা যেখানে শিক্ষার্থী কম্পিউটারে বা স্মার্টফোন মোবাইলে টেক্সট, অডিও, ভিডিও ইত্যাদির মাধ্যমে ঘরে বসেই বিভিন্ন ধরনের বিষয় শিখতে পারে।

টিউটোরিয়াল বিভিন্ন ফরমেটের হয়ে থাকে।

১. টেক্সট ফরমেট;
২. অডিও ফরমেট;
৩. ভিডিও ফরমেট;
৪. ইন্টারএ্যাকটিভ ফরম্যাট।

টিউটোরিয়াল অনলাইন ভিত্তিক এবং অফলাইন ভিত্তিক হতে পারে। যতক্ষণ ইন্টারনেট সংযোগ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী অনলাইন ভিত্তিক টিউটোরিয়ালে কাজ করতে পারে। ইন্টারনেট বা অনলাইন ভিত্তিক টিউটোরিয়াল ডাউনলোড করে অথবা অন্য কোন ডিভাইসের মাধ্যমে শেয়ার করে অফলাইনে কাজ করা হলে তাকে অফলাইন ভিত্তিক টিউটোরিয়াল বলে। ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলেও অফলাইন ভিত্তিক টিউটোরিয়ালে কাজ করা যায়। উদাহরণ: অফলাইন ভিত্তিক টিউটোরিয়াল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল কোন বিষয়ের উপর পিডিএফ (PDF-Portable Document Format) ফাইল ব্যবহার করে শেখা।

টিউটোরিয়ালের বৈশিষ্ট্য

- টিউটোরিয়াল অনলাইন এবং অফলাইন এই দুই ভিত্তিক হতে পারে;
- এর মাধ্যমে যে কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী ধাপে ধাপে শিখতে পারে;
- টিউটোরিয়াল শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে ও নির্দেশনা প্রদান করে;
- এটি স্বতন্ত্র বা গ্রুপ ভিত্তিক হতে পারে;
- টিউটোরিয়ালে মূল্যায়নের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়;
- এখানে ব্যবহারিক দিকটা বেশি প্রাধান্য পায় এবং
- অনলাইন ভিত্তিক টিউটোরিয়ালের ক্ষেত্রে জীবনঘনিষ্ঠ উদাহরণ দেয়ার চেষ্টা থাকে যার ফলে এটি গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষের থেকে অনেক বেশি জীবনভিত্তিক হয়ে থাকে।

টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে শিখনের ধাপ

টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে শিখনের ক্ষেত্রে মূলত তিনটি ধাপ রয়েছে। যথা– পরিচয় করানো, সমৃদ্ধকরণ ও সংশোধন। টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে শিখনের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হল নির্দিষ্ট কন্টেন্ট এর সাথে পরিচিত হওয়া। এর জন্য নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর পরিচিতিমূলক বিভিন্ন টিউটোরিয়াল পড়তে হয় শিক্ষার্থীদেরকে। যে স্তরে প্রাথমিকভাবে পরিচিত হওয়া বিষয়বস্তুর উপর গভীরভাবে জানার জন্য শিক্ষার্থী আরও অন্যান্য বিভিন্ন টিউটোরিয়াল থেকে পড়ে জেনে নেয় সেটি হল সমৃদ্ধকরণ ধাপ। পরবর্তিতে যে ধাপে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব দুর্বলতা এবং সম্যসাগুলো দূর করে নেয় তাকে সংশোধন ধাপ বলে। আর যে সমস্ত টিউটোরিয়াল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের এসব দুর্বলতা এবং সম্যসাগুলো দূর করা হয় তাদেরকে সংশোধনমূলক টিউটোরিয়াল বলে।

টিউটোরিয়ালের প্রয়োজনীয়তা

জানা জিনিসকে পুরোপুরি জানার জন্য টিউটোরিয়াল প্রয়োজন। ধরা যাক, কোন একটি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী ৬০% বা ৭০% জানে। এখন উক্ত বিষয়ে পুরোপুরি জানার জন্য সে ইচ্ছে করলে স্ব-উদ্যেগে টিউটোরিয়াল ব্যবহার করে জানতে পারে বা শিখতে পারে। যেমন– কোন শিক্ষার্থী কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহ সম্পর্কে তার পাঠ্যবইয়ে হালকা জানতে পেরেছে। এখন সে যদি এ বিষয়ে আরও বিস্তৃতভাবে জানতে চায় তাহলে CAL ভিত্তিক বিভিন্ন টিউটোরিয়াল এর সহায়তা নিতে পারে। এক্ষেত্রে সে টেক্সট ফরমেট, অডিও ফরমেট, ভিডিও ফরমেট, ইন্টারএ্যাকটিভ ফরমেটের মধ্য থেকে যে কোনো টিউটোরিয়াল ফরমেটের অথবা প্রয়োজনে একাধিক ফরমেটের সহায়তা নিয়ে জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে পারে। জানা বিষয়ের ওপর আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করার জন্য টিউটোরিয়াল প্রয়োজন। অর্থাৎ কোন শিক্ষার্থী যা জানে তার Beyond the Boundary-তে যাবার জন্য টিউটোরিয়াল প্রয়োজন। শিক্ষার্থী তার জানার পরিধিকে যদি আরও বাড়াতে চায় তাহলে সে CAL ভিত্তিক বিভিন্ন টিউটোরিয়ালের সহায়তা নিয়ে তা অর্জন করতে পারবেন।

শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই শিখার জন্য টিউটোরিয়াল প্রয়োজন। অর্থ্যাৎ স্বশিক্ষিত হবার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে টিউটোরিয়ালের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। যেমন– কেউ যদি মাইক্রোসফ্ট এক্সেল ব্যবহার করে হিসাব নিকাশের কাজ শিখতে চায় তাহলে এ সম্পর্কিত CAL ভিত্তিক বিভিন্ন টিউটোরিয়ালের সহায়তা নিয়ে নিজে নিজেই হিসাব নিকাশের কাজ করতে পারে।

শিক্ষার্থী যদি কোন কারণে ক্লাস মিস করে তাহলে সেই বিষয়ের দুর্বলতা থেকেই যায়। কিন্তু টিউটোরিয়ালে শিক্ষার্থীর কাছে সবগুলো লেসন সব সময়ের জন্যই থাকবে। যে কোন সুবিধামতো সময়ে সেটিউটোরিয়াল এর সহায়তায় এ দুর্বলতা নিয়ে নিজেই দূর করতে পারেন। এক্ষেত্রে এই ধরনের দুর্বলতা সহজেই দূর করা সম্ভব। অজানা বিষয়কে জানার জন্য টিউটোরিয়াল বেশি কার্যকর। টিউটোরিয়াল বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ধারণা গঠনে উন্নয়নে সাহায্য করে।

টিউটোরিয়াল টেক্সট ফরমেট, অডিও ফরমেট, ভিডিও ফরমেট, ইন্টারএ্যাকটিভ ফরমেটের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের ধারনার উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের সুবিধামত সময়ে যে কোনো বিষয় শিখতে পারে, জানতে পারে এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারে। স্ব-শিক্ষণের পাশাপাশি কয়েকজন মিলে গ্রুপ করেও যে কোনো বিষয়ে জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক কোর্সের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী এক ক্লাস একই দুইবার করতে পারে না কিন্তু টিউটোরিয়াল এ শিক্ষার্থী একই লেসন যতবার খুশি দেখতে পারে। এতে করে শিক্ষার্থী প্রতিটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শিখতে পারে।

টিউটোরিয়াল এর অন্যতম সুবিধা হল এটি শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী (Need Based) শিখতে সাহায্য করে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক কের্সের ক্ষেত্রে ব্যয় তুলনামূলক অনেক বেশি কিন্তু টিউটোরিয়ালের ব্যয় সেই তুলনায় অনেক কম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. CAL কী?
ক. Computer Assisted Learning
খ. Computer Associated Lerning
গ. Computer And Learning
ঘ. Computer AsLearning

২. নিচের কোনটি CAL উপকরণের অন্তর্ভুক্ত?
ক. টিউটোরিয়াল
খ. সিমুলেশন
গ. খেলাধুলা
ঘ. সবকটি

৩. CAL-এর সুবিধানয় কোনটি?
ক. মিথস্ক্রিয়া খুব ভাল হয়
খ. লেভেল অনুযায়ী শিক্ষা দেয়া
গ. শিক্ষার্থীদেরকে বিচ্ছিন্ন করে না
ঘ. চাহিদাভিত্তিক নয়

৪. নিচের কোন ২টি পরিপূরক?
ক. সিমুলেশন ও টিউটোরিয়াল
খ. ড্রিল এবং চর্চা
গ. খেলাধুলা ও চর্চা
ঘ. সিমুলেশন ও ড্রিল

৫. ড্রিল এবং চর্চার সর্বাপেক্ষা সুবিধা কোনটি?
ক. ব্যবহারিক দিকের উপর গুরুত্বারোপ
খ. অনুশীলন করা
গ. বিদ্যমান দক্ষতার কার্যকারিতা বৃদ্ধি
ঘ. কোনটি নয়

৬. সিমুলেশন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য কোনটি?
ক. শিক্ষণ দক্ষতাগুলো প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি
খ. ভুলত্রুটি সংশোধন
গ. বাস্তব পরিবেশের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া
ঘ. সবকটি

৭. টিউটোরিয়াল কয়টি ফরমেটের হয়ে থাকে?
   ক. ২
   খ. ৩
   গ. ৪
   ঘ. ৫

৮. অনলাইন ভিত্তিক টিউটোরিয়ালে নিচের কোনটি বিদ্যমান?
   ক. ইন্টারনেট সংযোগ থাকা
   খ. ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা
   গ. অফলাইনে শেখা
   ঘ. কোনটি নয়

৯. টিউটোরিয়াল কোন ক্ষেত্রে বেশি কাজ করে?
   ক. নতুন জানা বিষয়ের ক্ষেত্রে
   খ. অজানা বিষয়কে জানার জন্য
   গ. ক + খ
   ঘ. কোনটি নয়

উত্তরমালা: ১। ক, ২। ঘ, ৩। ঘ, ৪। খ, ৫। গ, ৬। ঘ, ৭। গ, ৮। ক, ৯। ক

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. কম্পিউটার নির্ভর শিখন (CAL) বলতে কী বুঝায়?
২. কম্পিউটার নির্ভর শিখন (CAL)-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী?
৩. CAL উপকরণের উদ্দেশ্যগুলো কী?
৪. ড্রিল এবং চর্চার মধ্যকার পার্থক্য কী?
৫. ড্রিল এবং চর্চার সুবিধাগুলো কী কী?
৬. কম্পিউটার নির্ভর খেলাধুলা (Games) উন্নয়ন বা ডিজাইনের প্রধান ধাপগুলো সম্পর্কে লিখুন?
৭. শিক্ষায় কম্পিউটার নির্ভর খেলাধুলার (Games) প্রয়োগ কী হতে পারে?
৮. সিমুলেশন কত প্রকার ও কী কী?
৯. টিউটোরিয়াল বলতে কী বুঝায়?
১০. টিউটোরিয়ালের কেন্দ্রিয় বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিখন-শিক্ষণে CAL ব্যবহারের সুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করুন।
২. বাংলাদেশে CAL উপকরণগুলোর উপযোগিতা সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদান করুন।
৩. শিক্ষায় সিমুলেশনের প্রয়োগ এবং উপযোগিতা সম্পর্কে আপনার অভিমত বর্ণনা করুন।
৪. টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়ার ধাপ বর্ণনা পূর্বক একটি ভাল টিউটোরিয়াল সংগঠনের নমুনা বা আদর্শস্বরূপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।
৫. ড্রিল এবং চর্চা, টিউটোরিয়াল ও সিমুলেশনের মধ্যে কোনটির উপকারিতা বেশি বলে আপনি মনে করুন– উত্তরের সপক্ষে আপনার সুচিন্তিত মতামত বর্ণনা করুন।

পাঠ ৫.৩: প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যার/ডিজিটাল কন্টেন্টের ব্যবহার: শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল কন্টেন্ট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যার/ডিজিটাল কন্টেন্টের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক লেখায় বলেছিলেন, ধান গাছে তক্তা হয়, না ধান হয় তা ধান ক্ষেতে গিয়ে দেখা উচিত। গ্রামগঞ্জে থাকা বিদ্যালয়ের কাছেই রয়েছে বাস্তব পরিবেশ যেখানে শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রমকে আনন্দদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। শহরে এই ধরনের পরিবেশ একেবারে হাতের কাছে পাওয়া মুশকিল। তবে যতখানি সম্ভব ডিজিটাল ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করা গেলে অন্ততপক্ষে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটারের মাধ্যমে যে কোনো ইমেজ, অডিও বা ভিডিও ইত্যাদি দেখানো যেতে পারে যার মাধ্যমে তারা কিছুটা বাস্তব পরিবেশের স্বাদ নিতে পারে।

এখনকার শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। তার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল কন্টেন্টের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় যে সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্যণীয় তার একটি হলো ডিজিটাল কন্টেন্ট বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন পদ্ধতি। অনেক সময় শিক্ষক নিজে ক্লাসে এ পদ্ধতিতে প্রেজেন্টেশন করেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রশ্ন-উত্তরের মধ্য দিয়ে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। আবার অনেক সময় শিক্ষার্থীদের ওপর অর্পিত কাজ হিসেবে এই প্রেজেন্টেশন দেয়া হয়।

ক. ডিজিটাল কন্টেন্ট

ডিজিটাল কনটেন্ট হলো পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়কে শব্দে, ছবিতে ও গতিময়তায় উপস্থাপনের জন্য নির্মিত শিক্ষকদের তৈরি অডিও-ভিজ্যুয়াল উপকরণ। একে অনেকে আবার মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন বা পাওয়ার-পয়েন্টভিত্তিক প্রেজেন্টেশন ও বলে থাকেন। শিক্ষকগণ আগে থেকেই কম্পিউটারে পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রামে বিভিন্ন ভিডিও, অডিও, ইফেক্ট, এনিমেশন ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকের কনটেন্টকে স্লাইডে রূপান্তরিত করবেন। পরে শ্রেণিকক্ষে সেটি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন। এতে পাঠ্যপুস্তকের অক্ষরে বর্ণিত ঘটনা বা বিষয় শিক্ষার্থীর কাছে শব্দে, চিত্রে, গতিময়তা, ভিডিও এবং এনিমেশনের মাধ্যমে সহজেই জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে।

অন্যভাবে, ডিজিটাল কন্টেন্ট হলো ডিজিটালিস্টোরেজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান যে কোন ধরনের কন্টেন্ট। ডিজিটাল কন্টেন্ট বিভিন্ন ধরনের হতে পারে– টেক্সট, অডিও, ভিডিও, ছবি, তথ্য, ইমেজ, অ্যানিমেটেড ছবি ইত্যাদি। তবে ডিজিটাল কন্টেন্টকে আবার মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট কিংবা সাধারণভাবেই– কন্টেন্ট বলে থাকে অনেকে।

ডিজিটাল কন্টেন্টের বৈশিষ্ট্য

এটি প্রচলিত শিক্ষা উপকরণের পাশাপাশি আইসিটি উপকরণের সমন্বয়ে গঠিত পরিকল্পিত পাঠ উপকরণ। এটি মূলত: কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে পাওয়ার পয়েন্টে পাঠ উপস্থাপন। এতে থাকে–

- শিক্ষার্থীরা কী করবে তার নির্দেশনা;
- বিষয়কে সহজে উপস্থাপনের জন্য টেক্সট, অডিও, ভিডিও, ছবি ইত্যাদি।

ডিজিটাল-কন্টেন্টের ধারণার আলোচনা থেকেই এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তথাপি, ডিজিটাল-কন্টেন্টের বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্দিষ্ট আঙ্গিকে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ডিজিটাল-কন্টেন্টের যে সকল বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হয়, সেগুলো হলো:

ডিজিটাল কন্টেন্টের ধরন

ডিজিটাল কন্টেন্টকে নির্দিষ্ট কয়েকটি ভাগে ভাগ করা বেশ জটিল কাজ। আবার, ডিজিটাল কন্টেন্টের ধরন সংখ্যাও নির্দিষ্ট নয়। কেননা আইসিটি ডিভাইসের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য এমন ডিজিটাল কন্টেন্ট অগণিত। এখানে আমরা পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত ডিজিটাল কন্টেন্টের কয়েকটি ধরন সম্পর্কে আলোচনা করব। মূলত শিক্ষাক্ষেত্রে যে ধরনের কন্টেন্ট ব্যবহার করা হয়, এ আলোচনায় সেগুলোর ধারণাই প্রাধান্য পাবে। মোটা দাগে আমরা ৭ ধরনের ডিজিটাল কন্টেন্ট পাই। নিচে একে একে আলোচনা করা হল।

১. **ডকুমেন্ট:** শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহৃত ডিজিটাল কন্টেন্টের অন্যতম ধরন হচ্ছে ডকুমেন্ট বা টেক্সট। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মাধ্যমে তৈরি বা ব্যবহারকৃত সব ফাইলই ডকুমেন্ট। তাছাড়া, Portable Document Format (PDF) বা পিডিএফ, নোটপ্যাডে সকল অ্যাপ্লিকেশনে তৈরি বা ব্যবহৃত সকল ফাইলই ডকুমেন্ট। একটি ডকুমেন্ট ফাইলের এক্সটেনশন কয়েক ধরনের হতে পারে। যথা: *.doc, *.docx, *.rtf, *.txt, *.pdf ইত্যাদি।

২. **অডিও:** যে কন্টেন্ট থেকে কেবল শব্দ বা সাউন্ড শোনা যায়, তাকে অডিও কন্টেন্ট বলা যায়। সাধারণত গান, কথোপকথন, নির্দেশনা ইত্যাদি শোনার কাজে আমরা অডিও কন্টেন্ট ব্যবহার করি। অডিও কন্টেন্টের পরিচিত ফরম্যাটগুলো হচ্ছে– *.mp3, *.wma, *.wav, *.aif, *.iff, *.m3u, *.m4a, *.mid, *.mpa, *.ra ইত্যাদি।

৩. **ভিডিও:** একই সাথে সাউন্ড ও চলমান চিত্র সমৃদ্ধ কন্টেন্টই ভিডিও। ভিডিওর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে চলমান চিত্র ফুটে ওঠে। তবে ভিডিওতে সাউন্ড থাকা বাধ্যতামূলক নয়। বিমূর্ত কোন ধারণাকে মূর্ত করে

তোলার ক্ষেত্রে ভিডিও কন্টেন্টের জুড়ি নেই। যে কোন মুভি, অ্যানিমেশন, কার্টুন কিংবা ডুকমেন্টারি ভিডিও কন্টেন্টের অন্তর্ভুক্ত। ভিডিও কন্টেন্টের পরিচিত ফরম্যাটগুলো হচ্ছে– *.mp4, *.mpg, *.avi, *.flv, *.3gp, *.vob, *.mov, *.wmv, *.srt, *.swf, *.3g2, *.asf, *.asx, *.m4v, *.rm ইত্যাদি।

৪. **ইমেজঃ** ইমেজ বা ছবির আরেক নাম স্থিরচিত্র। অর্থাৎ ভিডিওতে আমরা চলমান ছবি দেখি, আর ইমেজের ছবি হচ্ছে স্থির। কোন একটি নির্দিষ্ট সময় বা মুহূর্তের ছবি ধরে রাখা হয় ইমেজের মাধ্যমে। আবার কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ছবিও ইমেজের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে পাঠ পরিচালনার নানান ক্ষেত্রে ইমেজ ব্যবহার করা যায়। ইমেজের পরিচিত ফরম্যাটগুলো হচ্ছে– *.jpg, *.png, *.gif, *.psd, *.bmp, *.dds, *.pspimage, *.tga, *.thm, *.tif, *.tiff, *.zuv ইত্যাদি।

৫. **প্রেজেন্টেশনঃ** শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত ডিজিটাল কন্টেন্ট হচ্ছে প্রেজেন্টেশন। সাধারণত যে কোন ধরনের কন্টেন্টকেই প্রেজেন্টেশন আকারে প্রদর্শন করা যায়। তবে কিছু কিছু কন্টেন্ট কেবল উপস্থাপনার উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়। এ ধরনের কন্টেন্টকেই বিশেষত প্রেজেন্টেশন কন্টেন্ট বলা যায়। প্রেজেন্টেশন কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে–Microsoft PowerPoint। তবে সাম্প্রতিককালে Prezi, Google Docs, Zoho Show, Sliderocket এসব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমেও প্রেজেন্টেশন কন্টেন্ট তৈরি করা হয়। প্রেজেন্টেশন কন্টেন্টের পরিচিত ফরম্যাটগুলো হচ্ছে- *.ppt, *.pptx, *.ppsx., *pps, *.pez, *.odp, *.sxi ইত্যাদি।

৬. **ওয়েবসাইটঃ** ওয়েবসাইটকে সাধারণত আলাদা এক ধরনের কন্টেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। তবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে কোন কিছু প্রদর্শন করতে চাইলে, অবশ্যই কোন না কোন ওয়েবসাইটে যেতে হয়। ওয়েবসাইটে যে লেখা বা বর্ণনা থাকে তাকে আমরা ওয়েবসাইট কন্টেন্ট বলে অভিহিত করতে পারি। ওয়েবসাইটের কোন একটি পৃষ্ঠা আমরা সংরক্ষণ করে রাখতে পারি। পরবর্তীতে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলেও সেই পৃষ্ঠা আমরা দেখতে পারি। কোন ওয়েবপেজ সংরক্ষণ করা হলে তার এক্সটেনশন কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন– *.html, *.htm, *.xhtml, *.php, *.rss, *.asp, *.aspx, *.cer, *.cfm, *.csr, *.css, *.js, *.jsp ইত্যাদি।

৭. **ইনফোগ্রাফঃ** ডিজিটাল কন্টেন্টের এই ধরনটি নতুন বা আলাদা কোন ধরন নয়। ইনফোগ্রাফ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইমেজ হয়। তবে এর বিশেষত্ব হল এখানে তথ্যকে ছবি আকারে প্রদর্শন করা হয়। তাছাড়া গ্রাফ, চার্ট এগুলোকেও ইনফোগ্রাফ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ইনফোগ্রাফের ফাইল এক্সটেনশন ইমেজের মতই।

খ. ডিজিটাল কন্টেন্টের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিবেচ্য

ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতের জন্য পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশ কতগুলো বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন:

- তুলনামূলক জটিল বিষয়বস্তু;
- শিক্ষাক্রমের প্রত্যাশিত শিখনফল;
- পড়তে শেখার কার্যকরী উপাদান;
- পঠন দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী বিষয়বস্তু;
- শ্রেণিকক্ষে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা যায় না এমন বিষয়বস্তু;
- তথ্য-প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারোপযোগী বিষয়বস্তু;
- শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে উপস্থাপনযোগ্য বিষয়বস্তু।

যেভাবে তৈরি করবো–

- কাজ ১- ফোল্ডার খোলা;
- কাজ ২- এমএস পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল খুলে ফোল্ডারে সেভ করা;
- কাজ ৩- প্রয়োজনীয় স্লাইড সংযোজন করা;
- কাজ ৪- স্লাইডে প্রয়োজনীয় টেক্সট লেখা;
- কাজ ৪- প্রয়োজনীয় শেপ আনা/ইনসার্ট করা;
- কাজ ৫- ইন্টারনেট থেকে চিত্র ডাউনলোড করা;
- কাজ ৬- চিত্র স্লাইডে নিয়ে আসা;
- কাজ ৭- ভিডিও ডাউনলোড করা;
- কাজ ৮- ভিডিও স্লাইডে সংযুক্ত করা;
- কাজ ৯- স্লাইড এনিমেশন দেয়া;
- কাজ ১০- সেভ করা।

গ. ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনা (পাঠ পরিচালনা সম্পর্কিত)

ডিজিটাল কন্টেন্টসমূহ শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলো বিষয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। এগুলো নিচে উল্লেখ করা হল:

- ডিজিটাল কন্টেন্টে বিষয়বস্তু টেকনোলজি ও পেডাগজির সুষ্ঠ ব্লেন্ডিং থাকতে হবে।
- কন্টেন্টের ব্যবহার পাঠসংশ্লিষ্ট হতে হবে।
- ডিজিটাল কন্টেন্টকে বোধগম্য করে তুলতে হবে।
- ডিজিটাল কন্টেন্টগুলো মূলত শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনাকে আরও সহজ, কার্যকর ও আনন্দদায়ক করার জন্য তৈরি করা হয়। আর তাই ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রদর্শনের সময় শিক্ষককে বিভিন্ন অংশে থেমে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টিকে বোধগম্য করে তুলতে হবে। যেমন– যুক্তবর্ণের কন্টেন্টে শুধু যুক্তবর্ণগুলো একের পর এক দেখালে শিক্ষার্থীরা সেগুলো শিখতে পারবে না। প্রথমে পাঠ্যবইয়ের কোন একটি গল্প বা কবিতায় ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট শব্দটির সাথে শিক্ষার্থীদেরকে পরিচয় করাতে হবে। তারপর প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল কন্টেন্টের যুক্তবর্ণ অংশ থেকে ঐ নির্দিষ্ট যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট শব্দটি দেখিয়ে কোন কোন বর্ণের সমন্বয়ে যুক্তবর্ণটি তৈরি হয়েছে তা বুঝিয়ে বলতে পারেন। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। প্রয়োজনে বোর্ড ব্যবহার করবেন।
- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরা। ডিজিটাল কন্টেন্ট নির্ভর শ্রেণিকক্ষে সর্বাগ্রে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া ডিজিটাল কন্টেন্টে গেইমের সমন্বয় থাকতে পারে। গেইমগুলো খেলার সময় শিক্ষার্থীদেরকে অংশগ্রহণ করানো উচিত। প্রতিটি গেইম এমন যে, একের পর এক এসে অনেক শিক্ষার্থী মিলে গেমইটি খেলতে পারবে। আবার ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়েও গেইমগুলো খেলা যায়। গেইম খেলার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। এক্ষেত্রে নিচের উদাহরণটি দেখা যেতে পারে–

ঘ. শিক্ষার্থীদের চিন্তার উদ্রেক ঘটানো

কোন ডিজিটাল কন্টেন্টের পরবর্তী ধাপে যাওয়ার আগেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ঐ ধাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। যেমন– বর্ণমালার কন্টেন্টে প্রতিটি বর্ণের সাথে বইয়ের শব্দ ছাড়াও আরও শব্দ দেয়া হয়েছে। 'ক' বর্ণ দিয়ে বইয়ের 'কলম' ছাড়াও পরের ধাপে আরও ৪টি শব্দ দেয়া আছে। 'কলম' আলোচনার পর শিক্ষক জিজ্ঞেস করবেন, 'ক' দিয়ে আর কোন কোন শব্দ হতে পারে। তারপর অন্য শব্দগুলো দেখাবেন।

অন্যদিকে, ডিজিটাল কন্টেন্টে নিম্নোক্ত উপায় অনুসরণ করে বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের চিন্তার উদ্রেক ঘটানো যেতে পারে।

ঙ. ডিজিটাল কন্টেন্টকে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন সংশ্লিষ্ট করে তোলা

প্রতিটি ডিজিটাল কন্টেন্টকে শিক্ষার্থীদের জীবন ঘনিষ্ঠ করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। যেমন– 'ফুল-ফল ও পশু-পাখি' কন্টেন্টের অনেক জিনিসই শিক্ষার্থীরা তাদের বাস্তব জীবনে দেখে থাকবে। প্রথমে এই জিনিসগুলো তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ করে তুলে, তারপর ডিজিটাল কন্টেন্টে ছবি দেখাতে হবে এবং করতে হবে।

ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া

শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনায় ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। আর ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের পূর্বে প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত করা। বর্তমানে শিক্ষক নিজেরাই বিভিন্ন ধরনের প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত করে পাঠ পরিচালনায় ব্যবহার করছেন। তাই শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর সমন্বয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদেরকে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতের জন্য অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে মৌলিক তথ্য-প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকা। তবে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতের জন্য তথ্য-প্রযুক্তিগত দক্ষতাই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। একটি কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত করা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা বিজ্ঞানপ্রসূত বিভিন্ন বিষয় যেমন বিবেচনায় আনতে হয়, তেমনি কন্টেন্ট প্রস্তুতের জন্য কোন সফ্টওয়্যার উপযোগীতাও বিবেচনার সুযোগ থাকে।

ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতের পর্যায়

ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে চূড়ান্তকরণ পর্যন্ত আদর্শগত ভাবে ৫টি ধাপ অনুসরণ করা যেতে পারে। ধাপগুলো নিম্নরূপ:

১. বিশ্লেষণ পর্যায় (Analysis Phase)

শিক্ষা বিজ্ঞানীরা ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতের এই ধাপকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন। কেননা এই ধাপে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতের জন্য যাবতীয় বিষয়াদী বিবেচনা করা হয়। এই ধাপে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় আনতে হয় এবং সাথে সাথে সে বিষয়গুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সেগুলো হলো:

- কোন বিষয়বস্তুর উপর ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করাহবে;
- ঐ বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলগুলো কী কী;
- কোন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই কন্টেন্টটি তৈরি করা হবে;
- ঐ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা ও প্রবণতা কোন পর্যায়ের;
- সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুটি শ্রেণিতে বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী শিখনক্রম কী;
- ঐ বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে কোন শিক্ষণ-শিখন কৌশল নির্ধারিত আছে;
- বিষয় বস্তুটিকে শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়নের জন্য কী কী উপকরণ বিদ্যমান আছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে পাঠ্যবইয়ের বিষয় বস্তুটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে হবে এবং ঐ বিষয় বস্তুটির ওপর ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণের উপযোগিতা যাচাই করতে হবে।

২. ডিজাইন পর্যায় (Design Phase)

এই ধাপে মূলত ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। যিনি ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করবেন তার দক্ষতার পর্যাপ্ততা এই ধাপে গুরুত্বপূর্ণ। যদি কারো কেবল পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির সমক্ষতা থাকে, তিনি নিশ্চয় ভিডিও কন্টেন্ট তৈরির পরিকল্পনা করবেন না। তাই এই ধাপে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কোন সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করা হবে। তাছাড়া, কন্টেন্টে কী ধরনের লেখা

এবং ছবি থাকবে সে পরিকল্পনাও এ ধাপে করতে হবে। পাঠ পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কন্টেন্ট কীভাবে ব্যবহৃত হবে সে ব্যাপারটিও এই ধাপে ঠিক করা যেতে পারে।

৩. প্রস্তুতকরণ পর্যায় (Development Phase)

এই ধাপেই মূলত ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত করা হয়। পূর্ববর্তী ধাপের পরিকল্পনা অনুযায়ী এ ধাপে কন্টেন্ট তৈরির কাজে হাত দিতে হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কন্টেন্টে লেখা, ছবি ইত্যাদি ইনপুট দেয়া হয়। কন্টেন্টকে ইন্টারঅ্যাকটিভ করার জন্য প্রয়োজনীয় রং ও ডিজাইন সংযুক্ত করা যেতে পারে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে লেখা ও ছবিতে অ্যানিমেশন দেয়া যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপযোগী সাউন্ডও যোগ করা যেতে পারে। ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণে শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও সামর্থ্য বিবেচনার ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন জটিল কোন ছবি বা লেখা সংযুক্ত করা উচিত হবে না, যা সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের বুঝতে অসুবিধা হয়। তাছাড়া, প্রারম্ভিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুতকৃত কন্টেন্টে লেখার চেয়ে যেন ছবি বেশি থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে।

৪. পরীক্ষণ পর্যায় (Testing Phase)

এ পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল কন্টেন্টটি পরীক্ষা করতে হবে। এ পরীক্ষণের কাজটি দু'টি আঙ্গিক থেকে করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে, কারিগরী, আর অন্যটি হচ্ছে, বাস্তবায়ন যোগ্যতা। প্রথমে দেখতে হবে যে কন্টেন্টটি তৈরি করা হল, তা কারিগরী দিক থেকে ঠিক আছে কিনা। কন্টেন্টটি তৈরি করার পর তা কম্পিউটার কিংবা সংশ্লিষ্ট যন্ত্রে চালিয়ে দেখতে হবে যে, এটাতে কোন সমস্যা দেখা দিচ্ছে কিনা। পরবর্তীতে, যে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কন্টেন্টটি তৈরি করা হল, তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে ঐ কন্টেন্ট ব্যবহার করে একটি পাঠ পরিচালনা করা যেতে পারে। কন্টেন্টটি চলার সময় তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কন্টেন্টটি তাদেরকে কতটুকু আগ্রহান্বিত করতে পারছে তা বোঝা যাবে। পরিশেষে তাদের মতামত নেয়া যেতে পারে। মতামত নেয়ার জন্য কন্টেন্ট মূল্যায়ন চেকলিস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. চূড়ান্তকরণ পর্যায় (Finalization Phase)

পরীক্ষণ পর্যায়ে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এ ধাপে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে ডিজিটাল কন্টেন্টটি চূড়ান্ত করতে হবে।

একটি ডিজিটাল কন্টেন্ট কোন একটি নির্দিষ্ট পাঠের জন্য অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর তৈরি করা যায়। তাই কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন। ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতের উপরোক্ত পর্যায়গুলো নির্দিষ্ট বা বিধিবদ্ধ নয়। প্রয়োজনে এই প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হতে পারে। বর্তমানে প্রযুক্তির অগ্রগামীতার কারণে এখন অনেক কিছুই ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। কেউ যদি পাঠ্যবইয়ের উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে এবং তা অনলাইনে শেয়ার করে, তাহলে নির্দিষ্ট পাঠের ক্ষেত্রে সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু ইন্টারনেটে উন্মুক্তভাবে পাওয়া কন্টেন্টগুলো সবসময় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় না। সেক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের বিষয়ের সাথে মিলে এমন কন্টেন্ট খুঁজে বের করতে হবে। সেটা অডিও, ভিডিও, প্রেজেন্টেশন যে কোন কিছু হতে পারে। সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে, ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি কিংবা সংগ্রহ যাই করা হোক না কেন, মনে রাখতে হবে তা যেন শিক্ষার্থীদের কার্যকর শিখনে সহায়তা করে এবং প্রত্যাশিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করে।

পাঠ পরিচালনায় ব্যবহারোপযোগী ডিজিটাল কন্টেন্টের বিভিন্ন অংশ

পাঠ পরিচালনায় বাস্তবায়নযোগ্য ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত বা ব্যবহার করার জন্য নিম্নোক্ত অংশগুলো বিবেচনায় রাখা যেতে পারে:

ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে কার্যকর পাঠ পরিচালনা

ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত করলেই কাজ সমাপ্ত হয় না। শিক্ষায় তথ্য-প্রযুক্তির বাস্তব প্রতিফলন হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় এর ব্যবহার। আর পাঠ পরিচালনায় কন্টেন্ট বা ডিজিটাল কন্টেন্টের ব্যবহারের মাধ্যমেই সেটা সবচেয়ে ভালো ভাবে করা সম্ভব। পাঠ পরিচালনায় ডিজিটাল কন্টেন্টের ব্যবহারকে কার্যকর করাও একই সাথে জরুরি। পাঠ পরিচালনাকে কার্যকর করতে হলে শ্রেণিকক্ষে কতগুলো কাজ করতে হয়। নিম্নে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে একটি আদর্শ শ্রেণি শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে শিক্ষকের ভূমিকাগুলো কেমন হতে পারে, তা তুলে ধরা হল:

১. **প্রেষণা সৃষ্টি:** কোন একটি পাঠ শুরু করার আগে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজটি বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে। কোন একটি গল্প বলা যেতে পারে কিংবা এমন কিছু করা যেতে পারে যা শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়। তবে ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সৃষ্টি করার কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করা সম্ভব। ধরা যাক, শিক্ষক একটি পাঠে বাংলা বর্ণমালার ব্যঞ্জন বর্ণের প্রথম পাঁচটি বর্ণ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। তিনি পাঠের শুরুতেই কিছু জিনিসের ছবি দেখাতে পারেন, যেগুলো ঐ পাঁচটি বর্ণ দিয়ে শুরু হয়। এ ধরনের ছবি ইন্টারনেট থেকে অতি সহজে সংগ্রহ করা যায়। প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারলে শিক্ষার্থী মনোযোগী হয়ে ওঠে এবং পাঠের পরবর্তী অংশের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আর টেকসই শিখনের জন্য মনোযোগ সবচেয়ে জরুরি।
২. **শিখনফল অবহিতকরণ:** কার্যকর পাঠ পরিচালনার পরবর্তী কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীদেরকে শিখনফল সম্পর্কে অবগত করা। অর্থাৎ আজকের পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে তা তাদেরকে জানানো। এটা কাঠামোবদ্ধ হতে হবে এমন কোন কথা নেই। খুব সহজ ও সাবলীল ভাষায় তাদেরকে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা কী শিখবে তা জানলে, তাদের একটা মানসিক প্রস্তুতি তৈরি হবে। শিক্ষার্থীদের

আগ্রহ সৃষ্টি করার মাধ্যমে শিখনফল জানানো উচিত। অর্থাৎ আজকে যা শেখানো হবে তা জানা যে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা উল্লেখ করতে হবে।

৩. **পূর্ববর্তী পাঠের শিখন পর্যালোচনা:**এ পর্যায়ে আগের পাঠের শিখন পর্যালোচনা করা যেতে পারে। শিখনের পুনরাবর্তন শিখনকে টেকসই করে। আগের অংশে যে বিষয়বস্তু শেখার কথা বলা হল, পরের অংশে সেসব বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কেমন মনে আছে তা দেখা যেতে পারে।

৪. **বিষয়বস্তু উপস্থাপন:** এই অংশ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পাঠের মূল অংশ। শিক্ষক পূর্বেই প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল কন্টেন্ট এখানে উপস্থাপন করবেন। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় খেয়াল রাখবেন, সব শিক্ষার্থী যাতে প্রদর্শিত কন্টেন্টটি দেখতে পায় এবং শিক্ষকের কথা শোনে।

৫. **বিষয়বস্তু বোধগম্য করে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান:** বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলেই শুধু চলে না। বিষয়বস্তুকে বোধগম্য করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করাও জরুরি। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বয়সোপযোগী উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এ সমস্ত উদাহরণে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে পাঠ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ছবি বা ভিডিও দেখানো যেতে পারে।

৬. **শিখনের চর্চা করানো:** এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শিখনকে টেকসই করার জন্য চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। চর্চা করার ব্যবস্থা ডিজিটাল কন্টেন্টেই থাকতে পারে।

৭. **ফলাবর্তন প্রদান:** শিক্ষার্থীদের চর্চার ওপর ভিত্তি করে এই পর্যায়ে তাদেরকে ফিডব্যাক বা ফলাবর্তন প্রদান করতে হবে। চর্চা করতে গিয়ে কোন শিক্ষার্থী যদি ভুল করে, তাহলে সেটা কীভাবে করলে সঠিক হবে সেই মর্মে তাকে নির্দেশনা দেয়া উচিত। বিষয়বস্তুর যে অংশ আত্মস্থ করতে শিক্ষার্থীদের সমস্যা হচ্ছে মনে হয় সেই অংশ আবার আলোচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রেও ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮. **মূল্যায়ন:** এতক্ষণ যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হল, তা শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্বে আনতে পেরেছে সেটা যাচাই করার জন্য এধাপে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে হবে। এই মূল্যায়ন কাঠামোবদ্ধ করে না রাখাই ভালো। শিক্ষার্থীদেরকে মৌখিক প্রশ্ন করা যেতে পারে। আবার ডিজিটাল কন্টেন্টে মূল্যায়নের জন্য অ্যাক্টিভিটি সংযুক্ত করা যেতে পারে। যেমন– কারক শেখা শেষে শিক্ষার্থীদেরকে বেশ কয়েকটি শব্দ দেখানো যেতে পারে। তাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে কোনটা কোন কারক তা খুঁজে বের করবে।

৯. **টেকসই শিখনে উদ্বুদ্ধকরণ:** যে কোন শিখনই বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য। আর বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে চাইলে তার শিখনকে টেকসই করে তুলতে হবে। সেজন্য শিক্ষার্থীদেরকে তাদের শিখন ভবিষ্যতে কী কাজে লাগবে সে সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে চায়, তাই পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু আত্মস্থ করতে মনোযোগী হয়। কিন্তু তাদের শিখন কেবল পরীক্ষায় পাশের ক্ষেত্রেই কাজে লাগবে না। বরং তাদের জীবনকে সহজ ও সাবলীল করে তুলবে। যেমন– ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি ভিডিও দেখিয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতাবোধ তৈরি করা যেন তারা গাছপালা লাগানোর মত টেকসই কাজে উদ্বুদ্ধ হয়।

(**বি.দ্র.:** *উপরোক্ত মডেলটি রবার্ট গ্যাগনে'র "Conditions of Learning" তত্ত্ব থেকে অভিযোজন করা হয়েছে।)

ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও ব্যবহারে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

একজন বিষয় শিক্ষক পাঠদানের সময় গতানুগতিক বক্তৃতা থেকে বের হয়ে তার বিষয়টি সব শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় ও শিখন ফলপ্রসূ করার জন্য প্রযুক্তি, শিক্ষা বিজ্ঞান ও বিষয় জ্ঞানের সমন্বয় করে পাঠ উপস্থাপন করবেন। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে টেক্সট, ছবি, বিভিন্ন প্রকার চিত্র, মানচিত্র, অ্যানিমেশন, গ্রাফ-চার্ট, ভিডিও ইত্যাদি। এক্ষেত্রে প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যার হিসেবে বেছে নেয়া যেতে পারে মাইক্রোসফ্ট পাওয়ার পয়েন্ট।

শিক্ষক প্রয়োজনে অন্য কোন ওয়েবসাইট বা ওয়েববেজড উপকরণের সহায়তা নিতে পারেন। এভাবে শিক্ষকের মাধ্যমে তৈরি শিখনীয় বিষয়বস্তুর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনকেই আমরা বলছি শিক্ষক নির্মিত ডিজিটাল কন্টেন্ট।

শিক্ষা বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী পাঠ পরিকল্পনার সোপান ও ছক মোতাবেক শিক্ষককে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করতে হয়। যাতে থাকবে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ উপযোগী কাজ, বোর্ডের ব্যবহার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের প্রশ্নকরণ, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশল ও পদ্ধতির ব্যবহার, শিক্ষার্থী মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল ব্যবহারের সুযোগ। শিক্ষককে কন্টেন্ট তৈরির শুরুতেই একটি পরিকল্পনা করতে হয়। পরিকল্পনায় যে বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেয়া হয়, পাঠের শিখনফল কী হবে, শিক্ষক কীভাবে পাঠ শুরু করবেন, উপস্থাপনের সময় কী ধরনের ইমেজ, ভিডিও এবং অ্যানিমেশন ব্যবহার করবেন, কোথায় কীভাবে শিক্ষার্থীদের শ্রেণির কাজে অংশগ্রহণ করাবেন, মূল্যায়ন কীভাবে করবেন, বাস্তবভিত্তিক বাড়ির কাজ দিবেন এবং সর্বোপরি খেয়াল রাখবেন কীভাবে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো যায়। ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়নে দেশীয় ইমেজ, ভিডিও এবং প্রেক্ষাপটকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। মানানসই রং ও সহজ অ্যানিমেশনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। উপস্থাপনের সময় প্রয়োজনে শিক্ষক প্রজেক্টর অফ রেখে বোর্ডের কাজ বা অন্য শ্রেণির কাজ করবেন। যে বিষয় বা বস্তু বাস্তবে দেখানো যায় সেসব বিষয়বস্তু উপস্থাপনে ডিজিটাল কন্টেন্টের প্রয়োজন নাই।

এছাড়া ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি এবং ব্যবহারে অন্যান্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হল:

- ডিজিটাল কনটেন্ট শিক্ষকের বিকল্প নয়। এটি কেবল শিক্ষকের সহায়তা জন্য। অন্যান্য উপকরণের যেত এবং অন্যান্য উপকরণের সাথে শিক্ষক এটি ব্যবহার করবেন।
- স্থানীয়/দেশীয় পেক্ষাপট (সামাজিক, ধর্মীয়, ভৌগলিক) বিবেচনা করে কনটেন্ট তৈরি হবে।
- যথার্থ ও পরিমিত এনিমেশন/ভিডিও/অডিও/চিত্র নির্বাচন যা শিখনফল অর্জনের জন্য সহায়ক হবে। কনটেন্ট তৈরি হবে বিষয় ও যথোপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন কৌশল মাথায় রেখে। যেমন– নিউক্লিয়ার ফিশন সম্পর্কে যদি প্রথমেই সকল তথ্য উপস্থাপন করা হয় তাহলে তা গঠন মতবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না।
- শ্রেণিকক্ষে কোন বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য সাধারণত জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে কঠিন, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট, দেখা থেকে অদেখা, কাছে থেকে দূরে এই নীতি অনুসরণ করা হয়। ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির সময় এই নীতিও খেয়াল রাখা দরকার।
- টেক্সট এর চেয়ে চিত্র, এনিমেশন বা ভিডিও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে। তাই ডিজিটাল কনটেন্টে টেক্সট এর চেয়ে চিত্র, এনিমেশন বা ভিডিও বেশি থাকা বাঞ্ছনীয়।
- বর্তমানে শিক্ষার্থীর শিখনে গুরুত্ব দেয়া হয় শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ও চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি করার। তাই মূল্যায়নের অংশসহ ডিজিটাল কনটেন্টের অন্যান্য অংশ তৈরিতে সৃজনশীলতা ও চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির দিকেগুরুত্ব দেয়া দরকার।
- শিক্ষার্থী তার সহপাঠীদের সহায়তায় ভাল শেখে। তাই দলগত কাজ প্রদান করে তাতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- কনটেন্ট তৈরির জন্য একজন শিক্ষকের কম্পিউটারের সাধারণ জ্ঞান, ইন্টারনেট থেকে ছবি, এনিমেশন বা ভিডিও ডাউনলোড করার কৌশল, তা পাওয়ার পয়েন্টে অন্তর্ভুক্ত করার দক্ষতা থাকতে হবে। বর্তমানে শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কনটেন্ট একটি বিশেষ ওয়েবসাইট এবং জাতীয়ই-তথ্য কোষে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষকগণ এসব সাইট থেকে ডিজিটাল কনটেন্ট সংগ্রহ করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পাদনা করে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে পারবেন। চাইলে শিক্ষার্থীরাও সেখান থেকে সাহায্য নিতে পারবে। বিশেষ করে বিজ্ঞান, গণিত, ব্যাকরণ এবং ইংরেজির মতো কঠিন বিষয়গুলো এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নিকট

আরও বোধগম্য এবং সহজ করে উপস্থাপন করা যায়। যেমন– মানুষের পরিপাকতন্ত্রের কাজ বোঝানোর সময় কম্পিউটারের মাধ্যমে একটি এনিমেশন বা ভিডিও ক্লিপই যথেষ্ট। এটি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া সহজে সম্ভব। এ পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের উপস্থাপনা সহজবোধ্য হওয়ায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব ও আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

- ডিজিটাল কন্টেন্টে ব্যবহৃত স্লাইডসমূহ তথ্য ভারাক্রান্ত না করে অল্প কথায় করতে হবে। স্লাইডগুলো যেন হয় সহজ ও সাধারণ, যেন একদৃষ্টিতে স্লাইডে কী উপস্থাপিত হয়েছে বোঝা যায়। মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনে শুধু টেক্সট ব্যবহার না করে অডিও, ভিডিও ইত্যাদি বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে তাহলেই প্রেজেন্টেশনটা হবে ডিজিটাল কন্টেন্ট ভিত্তিক প্রেজেন্টেশন। প্রেজেন্টেশন হতে হবে তত্ত্ব বিচারে সারগ্রাহী অথচ বিনোদনমূলক। তবে বিনোদনমূলক উপকরণের অতিরিক্ত ব্যবহারে তা যেন একাডেমিক ভাবগাম্ভীর্য না হারায় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।
- এক ডিজিটাল কন্টেন্টভিত্তিক প্রেজেন্টেশন দিয়েই ক্লাস শেষ না করে বরং নানা কার্যক্রমের সাথে ৫-৭ মিনিটের প্রেজেন্টেশন করা উত্তম। অন্যথায় দীর্ঘ ৪০ মিনিটের প্রেজেন্টেশনের মধ্যে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। যেমন– 'সমাজ জীবনে শিক্ষার প্রভাব' সংক্রান্ত ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন ভিত্তিক শ্রেণি কার্যক্রম এভাবে সাজানো যেতে পারে– প্রথমে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মন্তব্য জেনে নেওয়া, এরপর সমাজকে ম্যাক্রো ও মাইক্রো পরিসরে স্লাইড ব্যবহার করে উপস্থাপন, এরপর সমাজের সাথে শিক্ষার সম্পর্কের ইতিহাস লেকচার পদ্ধতিতে উপস্থাপন (স্লাইডের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে– তবে আলোচনা হতে হবে প্রাণবন্ত ও গল্পের মতো বা গল্প বলার ঢঙে), এরপর স্লাইড ব্যবহার করে 'শিক্ষার প্রভাব' উপস্থাপন, তারপর শিক্ষার্থীদের মতামত, ভাবনা ও প্রশ্নালোচনা এবং সবশেষে এমন কোনো ছবি বা ভিজ্যুয়াল উপকরণ দেখানো বা প্রশ্ন করা যাতে তারা শ্রেণিতে যা শিখলো-দেখলো সেগুলো নিয়ে পরবর্তীতেও ভাবনা চিন্তা।
- ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে 5P (PPPPP): Prior, Preparation, Prevents, Poor, Performance. ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় তাই পূর্ব প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করাতে পারলে কাজটি তারাও যেমন উপভোগ করবে, তেমনি শিখনটাও স্থায়ী হবে। তাই সবার সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ভাবগাম্ভীর্যকে দূরে ঠেলে শ্রেণিতে আনন্দ ঘন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলে এই শিখন অভিজ্ঞতা সে সহজে ভুলবে না।

ডিজিটাল কন্টেন্টের প্রয়োজনীয়তা বা সুবিধা

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি ডিজিটাল কন্টেন্টে শিক্ষণ-শিখন কাজকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে, কারণ এটি শিক্ষণীয় বিষয়কে শিক্ষার্থীর কাছে আরও বোধগম্য, মূর্ত ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে সহায়তা করে।
- যেভাবে ডিজিটাল কন্টেন্ট শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সুবিধা প্রদান করতে পারে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

  - বর্ণিল ও আকর্ষণীয় চিত্র, ভিডিও বা এনিমেশন শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখে।
  - কঠিন বিষয়কে সহজভাবে উপস্থাপন করা যায়।
  - বাস্তবে দেখানো যায় না এমন কোন কিছুর ভিডিও দেখানো যায়। যেমন– আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত।
  - খুবই ক্ষুদ্র/বড়/ধীরগতির/দ্রুতগতির কোন কিছুকে ভিডিওতে/এনিমেশনে বড়/ছোট/দ্রুত/ধীর করে দেখানো যায়।

- পাঠকে ভালভাবে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় ইত্যাদি।

- একবার তৈরি করা গেলে পরবর্তীতে সংশোধন/পরিমার্জন করে বার বার ব্যবহার করা যায়। ফলে শিক্ষকের সময় বাঁচে।
- শিক্ষার্থীর মনে বিষয়ভিত্তিক সুগভীর চিন্তার ধারাকে জাগ্রত করা তথা শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল করে তোলা শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য। যথাযথ ও পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহৃত ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারাকে জাগ্রত করার দিতে অসাধারণ একটি পদ্ধতি হতে পারে।

শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারে বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার

মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড (Microsoft Word)

কম্পিউটারের সাহায্যে আমরা যে কাজগুলো করি, তার মধ্যে অন্যতম হল ডকুমেন্ট তৈরি করা। আর এ কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং অত্যন্ত উপযোগী সফ্টওয়্যার হল Microsoft Word বা সংক্ষেপে MS Word (এমএস ওয়ার্ড)। এমএস ওয়ার্ড সাধারণত প্রতিবেদন, গবেষণা প্রবন্ধ, ডকুমেন্ট তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এমএস ওয়ার্ড হল MS Office-এর একটি অ্যাপ্লিকেশন। এটি ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

শ্রেণি কার্যক্রমে মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ডের ব্যবহার

মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড মূলত ডকুমেন্ট তৈরির কাজে ব্যবহৃত হলেও শ্রেণি কার্যক্রমে ডিজিটাল টেক্সট হিসেবে একে ব্যবহার করা সম্ভব। নিচে এ সম্পর্কিত কয়েকটি ধারণা প্রদান করা হল:

- কার্যকর পাঠ পরিচালনার অন্যতম পূর্বশর্ত পাঠ পরিকল্পনা। মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড ব্যবহার করে অতি সহজে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা যায়। প্রতিদিন পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে প্রিন্ট করার চেয়ে একটি কাঠামো বা ফরম্যাট পূর্বেই তৈরি করে অনেকগুলো কপি করে রাখা যেতে পারে। প্রতিদিন সেই ফরম্যাটগুলো পূরণ করলেই হবে।
- পাঠ পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করানোর জন্য ওয়ার্কশিট তৈরির কাজে মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড সহায়ক হতে পারে।
- শিক্ষার্থী মূল্যায়নপত্র প্রস্তুত করার জন্য মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ডের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদেরকে কোন বিশেষ কাজের নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড ব্যবহার করা যায়।
- কোন একটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে হ্যান্ডআউট দেয়ার জন্য মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড সহায়ক হতে পারে।
- অন্য কোন অ্যাপ্লিকেশনে দেখানো না গেলেও যে কোন ডকুমেন্ট মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ডে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব।

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ার পয়েন্ট (Microsoft PowerPoint)

Microsoft Office বা MS Office-এর আরেকটি অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে মাইক্রোসফ্ট পাওয়ার পয়েন্ট। মূলত যে কোন ডিজিটাল কন্টেন্ট উপস্থাপনায় সবচেয়ে ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে মাইক্রোসফ্ট পাওয়ার পয়েন্ট। এজন্য একে Presentation Software বলা হয়।

শ্রেণি কার্যক্রমে মাইক্রোসফ্ট পাওয়ার পয়েন্টের ব্যবহার

বর্তমানে পাঠ পরিচালনায় সর্বাধিক ব্যবহৃত ডিজিটাল কন্টেন্ট হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড। সাধারণত পাঠ উপস্থাপনার ক্ষেত্রেই বর্তমানে পাওয়ার পয়েন্ট বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এর বাহিরেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে পাওয়ার পয়েন্ট বেশ কার্যকর হতে পারে। নিচে সার্বিকভাবে পাওয়ার পয়েন্টের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

- স্লাইডে বিভিন্ন প্রশ্ন প্রদর্শনের মাধ্যমে গাঠনিক মূল্যায়নে Power পয়েন্ট একটি কার্যকর উপায় হতে পারে।
- বিভিন্ন কাজ ও কাজের নির্দেশনা প্রদর্শন করে কাজের মাধ্যমে শিখন (Learning by Doing) নিশ্চিত করা যায়।
- সাউন্ড ও অ্যানিমেশন যুক্ত করে বিষয়বস্তুকে উপভোগ্যভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- কাঠামোবদ্ধ কোন প্রক্রিয়া বা ধারণা প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রিন্টেড পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড বেশ কার্যকর হতে পারে।

সর্বোপরি পাঠ পরিচালনার যে কোন পর্যায়ে কোন কিছু প্রদর্শনের জন্য পাওয়ার পয়েন্ট শক্তিশালী একটি মাধ্যম।

পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়

পাওয়ার পয়েন্টে কেবল লেখা বা ছবি দিলেই হয় না, বরং পাওয়ার পয়েন্টের সুফল পেতে কিছু ব্যাপার বিবেচনায় রাখা জরুরি। এগুলো আলোচনা করা হল:

ফন্ট নির্বাচন: এমন ফন্ট নির্বাচন করতে হবে, যা দূর থেকেও সহজে বোঝা যায়। এক্ষেত্রে Times New Roman, Calibri, Arial, Gill Sans MT ইত্যাদি ফন্ট নির্বাচন করা যেতে পারে। এমন ফন্ট নির্বাচন করা উচিত হবে না, যেটা পড়তে কষ্ট হয়, যেমন– Freestzle Script, Curlz MT, Mistral ইত্যাদি। তবে স্লাইডকে দৃষ্টিনন্দন করে তোলার উদ্দেশ্যে একটু ব্যতিক্রমধর্মী ফন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এক বা দুই শব্দ বা নির্দিষ্ট কোন অংশের জন্য ঐ ফন্ট নির্বাচন করা যেতে পারে এবং তা এমনভাবে লিখতে হবে যাতে করে সহজে পড়া যায়।

ফন্টের সাইজ বা আকার: ফন্ট সাইজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে আনুমানিক কতজন শিক্ষার্থী থাকতে পারে, তা বিবেচনায় আনতে হবে। কেননা ফন্টের সাইজ যদি ছোট হয়, বড় শ্রেণিতে পেছন থেকে দেখা খুব কষ্টকর হয়ে ওঠে। সাধারণত কোন পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডের ফন্ট সাইজ ২৪ এর ছোট হওয়া উচিত নয়। একটি ছোট (যেমন– ৩০ জনের কম শিক্ষার্থী) শ্রেণিকক্ষের জন্য ২৪-৩২ হচ্ছে আদর্শ। মোটামুটি বড় শ্রেণিকক্ষের ক্ষেত্রে ৩৬-৪০ ফন্ট সাইজ নির্বাচন করা উচিত। আর স্লাইডের শিরোনামের ফন্ট সাইজ সাধারণ লেখার চেয়ে ৪ বা ৬ পয়েন্ট বেশি হওয়া উচিত।

লেখার পরিমাণ: কোন একটি নির্দিষ্ট স্লাইডে অনেক বেশি লেখা থাকা উচিত নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি স্লাইডে সর্বোচ্চ ৩৩টি শব্দ থাকতে পারে। আবার বুলেট ব্যবহার করে যদি কোন তালিকা উপস্থাপন করা হয়, সেক্ষেত্রে ৪ থেকে সর্বোচ্চ ৬টি বুলেট পয়েন্ট থাকা উচিত। অন্যদিকে, একটি স্লাইডে সর্বোচ্চ ৬টি লাইন থাকতে পারে। কোন একটি বাক্য দুই লাইনের বেশি না হলেই ভালো হয়।

স্লাইডের সংখ্যা: একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ফাইলে কয়টি স্লাইড হবে, তা নির্ধারিত হবে কতক্ষণ ধরে স্লাইডটি উপস্থাপন করা হবে। তবে সময় যাই হোক না কেন, অনেক স্লাইড দিয়ে প্রেজেন্টেশনটাকে ভারি করে তোলা উচিত নয়। আলোচনার বিষয়বস্তু অনেক বড় হলেও কম স্লাইডে তা শেষ করা উচিত। স্লাইডের বাহিরে

প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো উপস্থাপনের সময় আলোচনা করা উচিত। সাধারণত ১৫ মিনিটের একটি প্রেজেন্টেশনে ৬ থেকে সর্বোচ্চ ১০টি স্লাইড থাকতে পারে।

লেখা ও ব্যাক গ্রাউন্ডের রংঃ স্লাইডে রং নির্বাচনে সতর্ক থাকা উচিত। পাওয়ার পয়েন্টে ডিফল্ট অনেকগুলো টেমপ্লেট থাকে। যদি টেমপ্লেটের ব্যাকগ্রাউন্ডের রং গাঢ় হয়, তাহলে লেখার রং হালকা উজ্জ্বল রংয়ের হওয়া উচিত। আবার ব্যাকগ্রাউন্ডের রং হালকা বা সাদা হলে, লেখার রং গাঢ় হওয়া উচিত। অনেক সময় দেখা যায়, প্রজেক্টরের সাহায্যে প্রদর্শনের জন্য স্ক্রিনের পরিবর্তে দেয়াল ব্যবহার করা হয়। সেক্ষেত্রে দেয়ালের রং বিবেচনায় আনা উচিত। দেয়ালের রং সাদা হলে সমস্যা হয় না। কিন্তু অন্য রংয়ের হলে, তার উপর কোন রং ভাল দেখাবে তা নির্ধারণ করলে ভালো হয়।

সাউন্ড ও অ্যানিমেশনঃ মাইক্রোসফ্ট পাওয়ার পয়েন্টে লেখা বা ছবি আসা বা যাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাউন্ড ও অ্যানিমেশন যুক্ত করার সুযোগ আছে। সাধারণত মানসম্পন্ন প্রেজেন্টেশনে সাউন্ড খুব একটা ব্যবহার করা হয় না। তথাপি প্রারম্ভিক শ্রেণির শিশুদের জন্য তৈরি স্লাইডে সাউন্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, ব্যবহৃত সাউন্ড যাতে শ্রুতিমধুর ও আনন্দদায়ক হয়। অকারণ চমক সৃষ্টিকারী বা ভয়ঙ্কর কোন সাউন্ড ব্যবহার না করাই ভালো। অন্যদিকে, প্রেজেন্টেশনে হারহামেশাই অ্যানিমেশন ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রেও দেখতে ভালো লাগে এবং সরল, এ রকম অ্যানিমেশন ব্যবহার করাই ভালো।

কম লেখা বেশি ছবিঃ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, উপস্থাপনায় ছবির ব্যবহার দর্শকের মনোযোগ ও দৃষ্টি দুটোই আকর্ষণ করে। তাই স্লাইডে লেখা কম দিয়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি দেয়া যেতে পারে। ছবি অপ্রতুল হলে, লেখাগুলোকেই বিভিন্ন শেইপ ও স্মার্টআর্ট ব্যবহার করে দৃষ্টিনন্দন করে তোলা যায়।

শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারে বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে উপরোক্ত সফ্টওয়্যারগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ই-বই, ই-পাঠ্যপুস্তক এবং ই-শিখন উপকরণ
(E-book, E-textbook and E-learning Materials)

ই-বুক

ই-বুক এর পূর্ণরূপ হল ইলেক্ট্রনিক বুক।ই-বুক হল একটি বই যার প্রকাশনা করা হয়েছে ডিজিটাল আকারে, যাতে সাধারণ বইয়ের মতই লেখা, ছবি, চিত্রলেখ ইত্যাদি রাখা হয়েছে এবং এগুলো কম্পিউটার বা অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে পড়া যায়। ই-বুককে আবার ডিজিটাল বুক বা ই-সংস্করণও বলা হয়। যদিও কখনো কখনো বলা হয় ছাপানো বইয়ের ইলেক্ট্রনিক সংস্করন, তবুও অনেক ই-বই আছে যাদের কোন ছাপানো বই নেই। বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত করা এবং বিক্রিত ই-বই সাধারনত ই-রিডারে পড়ার উপযোগী করে বানানো হয়। যদিও প্রদর্শনে সক্ষম যে কোন যন্ত্রেই এটি পড়া। যেমন– কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ইত্যাদি।

ই-পাঠ্যপুস্তক

ই-পাঠ্যপুস্তক এর পূর্ণরূপ হল ইলেক্ট্রনিক পাঠ্যপুস্তক । ই-বুক এবং ই-পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে তেমন কোন তফাৎ নেই। ই-পাঠ্যপুস্তক মূলত ই-বুকের একটি ধরন। নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, ই-পাঠ্যপুস্তক হলো কোন নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যপুস্তককে ডিজিটাল ফরমেটে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে ব্যবহার উপযোগি করে প্রস্তুতকৃত ই-বুক। শিক্ষার্থীরা এই ই-পাঠ্যপুস্তক নিয়মিত পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি ব্যবহার করতে পারবে। যে কোন প্রদর্শন সক্ষমযন্ত্রেই এটি পড়া যায়। যেমন– কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ইত্যাদির মাধ্যমে এই ই-পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহার করা যাবে।

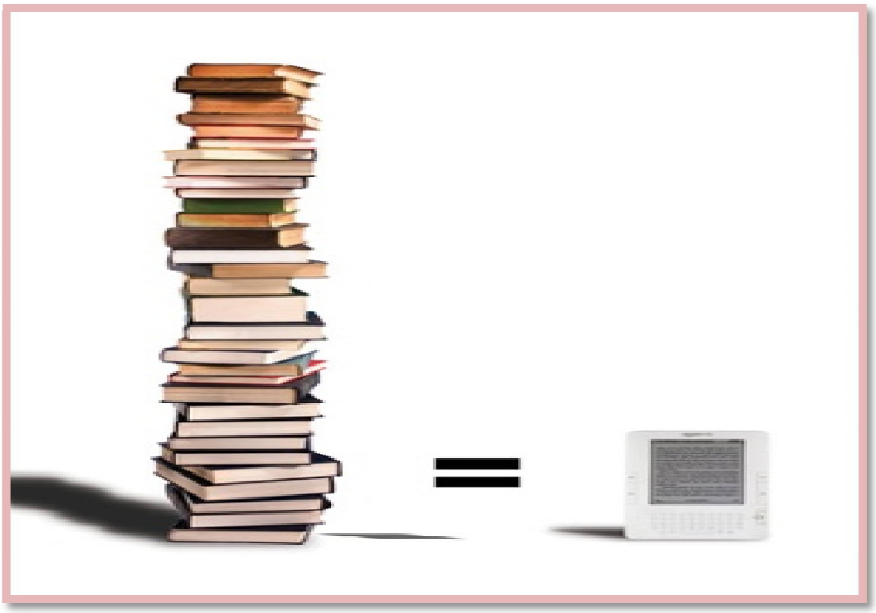

ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

- ই-বুকও ই-পাঠ্যপুস্তক বর্ণময় এবং চলমান।
- ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তককে নানা রঙে, নানা ঢংয়ে, নানা আকৃতিতে সাজানো যায়।
- ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তকের সাথে বিভিন্ন ছবি, এনিমেশন এবং গ্রাফিক্সের সমন্বয় করে টেক্সটকে গড়ে তোলা হয়।
- ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তক ইন্টারনেটে ব্যবহার করা যায় এবং ব্যবহারকারীর নির্দেশে সবাক হয়।
- ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তক সহজেই শেয়ার বা আদান-প্রদান করা যায়।

ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তক এর ক্ষেত্রে ‘5R’ মেনে চলতে হয়। এখানে ‘5R’ মানে হল–

এখানে, Retain বলতে নির্দিষ্টই-বুক ওই-পাঠ্যপুস্তকটি সংগ্রহ করা, Reuse বলতে নির্দিষ্টই-বুক ওই-পাঠ্যপুস্তকটি এবং পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা, Revise বলতে নির্দিষ্টই-বুক ওই-পাঠ্যপুস্তকটি প্রয়োজনে বারবার পড়া, Remix বলতে নির্দিষ্ট কতকগুলো ই-বুক এবং ই-পাঠ্যপুস্তক থেকে মিলিয়ে পড়া এবং Redistribute বলতে নির্দিষ্টই-বুক এবং ই-পাঠ্যপুস্তকের নতুন সংস্করণ সংগ্রহে রাখা বুঝায়।

শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

- শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয় সে সমস্ত বিষয়ের সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার জন্য ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হতে পারে।
- ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দলীয় এবং একক কাজ প্রদান করা যায়।
- ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে বেশি বেশি মিথস্ক্রিয়া করতে উৎসাহিত হয়।
- ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট অংশ হাইলাইট এবং মার্কিং করতে পারে যার মাধ্যমে পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী সে অংশটুকু দেখে নিতে পারে। এবং দলীয় কাজে হাইলাইট এবং মার্কিং করা অংশ বিশেষ নিয়ে আলোচনা করতে পারে।
- অন্যদিকে শিক্ষক ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তকে পঠিত অংশ হাইলাইট, নির্দেশনা এবং মন্তব্য প্রদান পূর্বক শেয়ার করতে পারে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ায় দিকনির্দেশনা প্রদান সম্ভবপর হয়। সেই সাথে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে।
- ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তকে সংযুক্ত বিল্ট-ইনডিকশনারি, উচ্চারণ এবং আরও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদেরকে জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, শব্দাংশ এবং টার্ম বুঝতে সাহায্য করে থাকে।
- কিছুকিছু ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তকে ভিডিও, অডিও, গ্রাফিক্স, এনিমেশন, ওয়েবলিংক ইত্যাদি সংযুক্ত থাকে যার মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া আরও বেশি ফলপ্রসূ, কার্যকর এবং মজাদার হয়ে থাকে।
- কিছুকিছু ই-বুকে ওয়াই-ফাই ডিভাইস থাকে এবং বিভিন্ন ওয়েবলিংক দেয়া থাকে যার মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই প্রয়োজনীয় বিষয়াদি আরও গভীর এবং বিস্তৃতভাবে জানতে পারে।
- এছাড়াও যেহেতু অনেক ই-বুকে ওয়াই-ফাই ডিভাইস থাকে তাই শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী যে কোন সময়ই তাদের শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তকের সুবিধা

১. সবচেয়ে বড় সুবিধা যে কোন সময় যে কোন অবস্থানে বসে শিক্ষা লাভ করা যায়।
২. সুনির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার প্রয়োজন হয় না তাই যাতায়াতসহ অবকাঠামোগত খরচ অনেক কম।
৩. একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন ই-বুক ও ই-পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায়।
৪. এগুলো সংরক্ষণের জন্য জায়গার পরিমাণ অনেক কম লাগে। যার দরুন হাজার হাজার লাইব্রেরি একটি স্মার্টফোন বা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায়।
৫. অর্থের প্রচুর সাশ্রয় করে।

অসুবিধা

১. শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সরাসরি যোগাযোগ না থাকায় অনেক প্রশ্নই উত্থাপন হয় না।
২. হাতে কলমের অনেক বিষয়ই ই-বুকের মাধ্যমে শেখা সম্ভব না।
৩. তথ্যপ্রযুক্তি ও শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নিজেদের একটা পূর্ব ধারনা থাকতে হয়।
৪. শিক্ষার্থীদের ই-বুক এবং ই-পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই।

৫. অনেক শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়।

ই-শিখন উপকরণ

বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রে ব্যবহার উপযোগি যে কোন ধরনের শিখন উপকরণকেই ই-শিখন উপকরণ বলা হয়। এগুলো হতে পারে কোন ছবি, অডিও, ভিডিও কিংবা পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ই-শিখন উপকরণের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিভিন্ন ধরনের ই-শিখন উপকরণ

ই-শিখন উপকরণ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন–

- ইন্টারেক্টভ লেসন ও স্বয়ংক্রিয় অনুশীলন সংযুক্ত সমন্বিত কোর্স মডিউল:
- ই-শিখন উপকরণের মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ, অধ্যায় ও অনুচ্ছেদভিত্তিক ইন্টারেক্টিভ লেসন এবং স্বয়ংক্রিয় অনুশীলন সংযুক্ত (পরীক্ষা, কুইজ ও সার্টিফিকেশন) সমন্বিত কোর্স মডিউল দেয়া থাকতে পারে।

জুম ও টাচ বৈশিষ্ট্য সক্রিয় বিষয় ও পরীক্ষাভিত্তিক ডাইনামিকই-কন্টেন্ট

এটিও এক ধরনেরই-শিখন উপকরণ। জুম ও টাচ বৈশিষ্ট্য সক্রিয় বিষয় ও পরীক্ষাভিত্তিক ডাইনামিক ই-কন্টেন্ট থাকলে এমন শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতা তৈরি হয় যেখানে শিক্ষার্থীরা কন্টেন্টের সাথে তাদের মস্তিস্কের সংযোগ করতে পারে। ফলে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক শিক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিতভাবে ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে।

ইন্টারেক্টিভ অডিও-ভিজুয়াল কথাবলা ই-বুক

ইন্টারেক্টিভ অডিও-ভিজুয়াল কথাবলা ই-বুক হলো বহুল ব্যবহৃত ই-শিখন উপকরণ। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ইন্টারেক্টিভ অডিও-ভিজুয়াল কথা বলা ই-বুক থাকলে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে লেখাপড়া করার উপযোগী এবং পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক।

অডিও, ভিডিও সমন্বিত ইন্টারেক্টিভ ও আকর্ষক 2D অ্যানিমেটেড কন্টেন্ট

শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন ফলপ্রসূ শিক্ষার জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট অডিও, ভিডিও সমন্বিত ইন্টারেক্টিভ ও আকর্ষক 2D অ্যানিমেটেড কন্টেন্ট ব্যবহার করা দরকার। এটিও এখনকার দিনে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার জন্য অতীব দরকারি ই-শিখন উপকরণ।

3D অ্যানিমেটেড ও ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক কন্টেন্ট

ই-শিখন উপকরণের অন্যতম আরেকটি ধরণ হলো 3D অ্যানিমেটেড ও ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষভিত্তিক কন্টেন্ট যা উন্নত দেশে বেশি দেখা যায়।

ই-লার্নিংকন্টেন্ট

প্রতিটি শ্রেণির এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত আধুনিক মানসম্পন্ন ই-লার্নিং কন্টেন্টও এক ধরনেরই-শিখন উপকরণ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণিতে ও বাসায় (কম্পিউটার/স্মার্টফোন/ট্যাব থাকলে) সকল অত্যাধুনিক সুবিধা পাবে।

মোবাইল লার্নিং কোর্স মডিউল ও মোবাইল শিক্ষা অ্যাপস

ই-শিখন উপকরণ এর সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরণ হলো মোবাইল লার্নিং কোর্স মডিউল এবং পাঠ, অধ্যায় ভিত্তিক মোবাইল শিক্ষা অ্যাপস।

পাঠ সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল স্টোরিটেলিং, মোশনগ্রাফিক্স ও ভিডিও কন্টেন্ট

শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল স্টোরিটেলিং, মোশনগ্রাফিক্স ও ভিডিও প্রোডাকশন ভিত্তিক ও পাঠসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন HD ভিডিও, জীবনী ও তথ্যচিত্র হলো উৎকৃষ্টই-শিখন উপকরণ।

পাঠ সংশ্লিষ্ট ইন্টারেক্টিভ গেম,সিমুলেশন ও কুইজ

শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট ইন্টারেক্টিভ গেম, সিমুলেশন ও কুইজও এক ধরণের ই-শিখন উপকরণ।

শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ই-শিখন উপকরণের ব্যবহার

- শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয় সে সমস্ত বিষয়ের সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার জন্য ই-শিখন উপকরণ ব্যবহৃত হতে পারে।
- ই-শিখন উপকরণ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দলীয় এবং একক কাজ প্রদান করা যায়।
- ই-শিখন উপকরণ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে বেশি বেশি মিথস্ক্রিয়া করতে উৎসাহিত হয়।
- ই-শিখন উপকরণ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদেরকে জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খুব সহজে বুঝতে সাহায্য করে থাকে।
- ই-শিখন উপকরণ এর ভিডিও, অডিও, গ্রাফিক্স, এনিমেশন ইত্যাদি শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও বেশি ফলপ্রসূ, কার্যকর এবং মজাদার করে থাকে।
- ই-শিখন উপকরণ এর মাধ্যমে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই প্রয়োজনীয় বিষয়াদি আরও গভীর এবং বিস্তৃতভাবে জানতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. 'এটুআই' এর পূর্ণরূপ কি?
ক. একসেস টু ইনজেকশন
খ. একসেস টু ইনফরমেশন
গ. একসেস টু ইউটিলিটি
ঘ. একসেস টু ইন-ভেরিফিকেশন

২. নিচের কোনটি ডিজিটাল কনটেন্টের অন্তর্গত নয়?
ক. অডিও
খ. ভিডিও
গ. ছবি
ঘ. ফ্ল্যাশকার্ড

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত ডিজিটাল কন্টেন্ট হচ্ছে–
ক. প্রেজেন্টেশন
খ. অডিও
গ. ভিডিও
ঘ. ছবি

৪. ডিজিটাল কনটেন্টের অন্য নাম কোনটি নয়?
ক. ই-কন্টেন্ট
খ. মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট
গ. এনালগ কন্টেন্ট
ঘ. কোনটি নয়

৫. ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুতের জন্য অন্যতম পূর্বশর্ত কোনটি?
ক. বিবেচ্য বিষয় জানা
খ. মৌলিক তথ্য-প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকা
গ. শিক্ষা বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারনা
ঘ. সবকটি

৬. ইমেজের পরিচিত ফরম্যাটগুলো কোনটি?
ক. mp4
খ. flv
গ. jpg
ঘ. 3gp

৭. ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরিতে আদর্শগতভাবে কয়টি ধাপ অনুসরণ করা যেতে পারে?
ক. ৩টি
খ. ৪টি
গ. ৫টি
ঘ. ৬টি

৮. ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত করা হয় কোন ধাপে?
ক. প্রস্তুতকরণ পর্যায়
খ. ডিজাইন পর্যায়
গ. বিশ্লেষণ পর্যায়
ঘ. ক + খ

৯. ডিজিটাল কন্টেন্টভিত্তিক শ্রেণিকক্ষে কিসের সংযোগ থাকা দরকার?
ক. হাস্যরস
খ. ভিডিও
গ. ছবি
ঘ. ক্রম-অনুশীলন

১০. সাধারণত কোন পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডের আদর্শ ফন্ট সাইজ কত?
ক. ৩৬-৪০
খ. ৩২-৩৬
গ. ৩০-৩৪
ঘ. ৩২-৩৫

উত্তরমালা: ১। খ; ২। ঘ; ৩। ক; ৪। গ; ৫। খ; ৬। গ; ৭। গ; ৮। ক; ৯। ঘ; ১০। ক।

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. ডিজিটাল কনটেন্ট কী?
২. ডিজিটাল কনটেন্টের ৩টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৩. শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরীতে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনের নাম লিখুন।
৪. ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে কার্যকর পাঠ পরিচালনার ধাপগুলো কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা করুন।
২. ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে কিভাবে কার্যকর পাঠ পরিচালনা করা যায় বর্ণনা করুন।
৩. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উচ্চশিক্ষায় ডিজিটাল কন্টেন্টের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
৪. ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে নিজ নিজ বিষয়ের উপর একটি ক্লাস কিভাবে নিবেন/পরিচালনা করবেন ব্যাখ্যা করুন।
৫. ডিজিটাল কন্টেন্ট কিভাবে টেকসই শিখনে উদ্বুদ্ধ করে, মতামত দিন।

পাঠ ৫.৪: শিক্ষার্থীদের শিখন কাজে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ এবং ট্যাবস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিখন-শিক্ষন প্রক্রিয়ায় ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহারের উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ল্যাপটপ

একটি ল্যাপটপ হল বহনযোগ্য ব্যক্তিগত কম্পিউটার যা দেখতে ঝিনুক আকৃতির এবং ভ্রমণ উপযোগি। ল্যাপটপ এবং নোটবুক উভয়কে পূর্বে ভিন্ন ধরা হত কিন্তু বর্তমানে তা মানা হয় না। ল্যাপটপ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়, যেমন– কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষায় এবং ব্যক্তিগত বিনোদনের কাজে।

ট্যাবস

ট্যাবস হলো এক ধরণের পার্সোনাল বা ব্যক্তিগত কম্পিউটার যা মোবাইলের ন্যায় দেখতে। যদিও এটির আকার মোবাইলের চেয়ে বড়। ট্যাবস ল্যাপটপের ন্যায় বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়, যেমন– কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষায় এবং ব্যক্তিগত বিনোদনের কাজে। তবে ল্যাপটপের চেয়ে এটি বহন করা খুব সহজ। ট্যাবস সাধারনত পকেটে করেই বহন করা যায়।

ল্যাপটপএবং ট্যাবস ব্যবহারের সুবিধা

ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহারের ফলে একজন শিক্ষার্থী যে সমস্ত সুবিধা পেয়ে থাকে সেগুলো নিম্নরূপ:

- **উৎপাদনশীলতা:** যেখানে ডেস্কটপ কম্পিউটার ব্যবহার করা যায় না, বা ডেস্কটপের জন্য বসে থাকলে যে সময়টুকু নষ্ট হত সেক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উৎপাদনশীলতা নিয়ে এসেছে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস। যেমন– একজন ছাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি বা কফি দোকানে বসে তার বাড়ির কাজ করে নিচ্ছেন।
- **বহনযোগ্যতা:** ডেস্কটপ পিসির সাথে যখন ল্যাপটপ এবং ট্যাবসকে তুলনা করা হয় বহনযোগ্যতাকে সবার প্রথমে ধরা হয়। এই সুবিধার কারণে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস যে কোন জায়গায় ব্যবহার করা যায়। যেমন– বাড়িতে, অফিসে, বিমানের ফ্লাইটে, মিটিংয়ে, কফি দোকানে, লেকচার হলে বা লাইব্রেরিতে ইত্যাদি।
- **তাৎক্ষনিক:** একটি ল্যাপটপ এবং ট্যাবস বহন করার অর্থ হল তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ও তথ্যের ভান্ডার সাথে নিয়ে হাটা। সেটা হতে পারে ব্যক্তিগত বা কাজের তথ্য, ফাইল ইত্যাদি। এর ফলে কাজের ক্ষেত্রে বা ছাত্রদের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। কারণ যখন তখন ল্যাপটপের ভাঁজ খুলেই বা ট্যাবস ওপেন করে কাজ শুরু করা বা দেখানো যেতে পারে।
- **তথ্যের সাথে পা মিলিয়ে চলা:** যদি একজন ব্যবহারকারী একটির বেশি ডেস্কটপ কম্পিউটার থাকে তবে তা কাজ গুছিয়ে নিতে সমস্যা তৈরি করে। এই সমস্যার সমাধান আছে। যেমন বসে থেকে ফাইল স্থানান্তর বা আবার এক ফাইল থেকে ডাটা অন্য ফাইলে স্থানান্তর, ইউএসবি ড্রাইভ দিয়ে বা সিডি দিয়ে অথবা ইন্টারনেটের সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে সিন্ক্রোনাইজেশনের মাধ্যমে। একটি ল্যাপটপ এবং ট্যাবস এই সমস্যাগুলোর ও সমাধান করতে পারে। কারণ এটা বহন করে যে কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

- **যোগাযোগঃ** ল্যাপটপে এবং ট্যাবসে ওয়াইফাই ও সেলুলার ব্রডব্যান্ড ডাটা সুবিধা থাকার ফলে যে কোন জায়গায় বসে (ওয়াইফাই সুবিধা আছে এমন জায়গায়, উন্নত বিশ্বের প্রায় সবজায়গায় এই সুবিধা পাওয়া যায়) সহজেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ সম্ভব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গনগুলো এর ভালো উদাহরন।
- **আকারঃ** ডেস্কটপের তুলনায় ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ছোট। এটি খুবই দরকারি যখন জায়গা ছোট হয়। যেমন– ছোট এপার্টমেন্টে বা ছাত্রাবাসে। আর যখন এটা ব্যবহার করা হয় না তখন বন্ধ করে সহজেই যে কোন জায়গায় রাখা যায়।
- **কমশক্তি খরচঃ** ডেস্কটপের তুলনায় ল্যাপটপ এবং ট্যাবস কয়েকগুণ শক্তি কম খরচ করে। গতানুগতিক ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহার করে ২০-১২০ওয়াট যেখানে ডেস্কটপ ব্যবহার করে ১০০-৮০০ ওয়াট। এই জন্যে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবসায়, বাড়ি ও শিক্ষার জন্য লাভজনক হতে পারে, এখানে এগুলো সারাদিনই চালানো হয়।
- **শব্দহীনঃ** ডেস্কটপের তুলনায় ল্যাপটপ এবং ট্যাবস কম শব্দ করে। সেহেতু এগুলো শিক্ষার জন্য খুবই ভাল এবং উপযোগি।
- **ব্যাটারিঃ** বিদ্যুৎ সঞ্চিত ল্যাপটপ এবং ট্যাবস কয়েক ঘন্টা বিদ্যুৎবিহীন চলতে পারে এবং এতে বৈদ্যুতিক উৎস থেকে উৎপন্ন সমস্যা যেমন– ব্ল্যাক আউট, লোডশেডিং, স্পার্ক ইত্যাদি হয় না। কিন্তু এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করতে একটি ডেস্কটপ পিসিতে ইউপিএস লাগে।
- **একের-ভিতর-সবঃ** ল্যাপটপ এবং ট্যাবসে সবকিছু একসাথে থাকে একটি জায়গায়। কিন্তু ডেস্কটপের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উপাদান আলাদা আলাদা থাকে।

শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহারের উপকারিতা

শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ই উপকৃত হচ্ছে। শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহারের কারণে যেসব উপকারিতা পাওয়া যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহার শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীনভাবে এবং স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত হয়ে শিখনে সহায়তা করে থাকে।
- এগুলো শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহন বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করে থাকে।
- শিক্ষকদেরকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্ব স্ব চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে এই ল্যাপটপ এবং ট্যাবস।
- শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জন অনেকটা সহজ করে।
- ল্যাপটপ এবং ট্যাবস শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শিক্ষার্থীদের শিখনকে উৎসাহিত করে থাকে।
- ল্যাপটপ এবং ট্যাবস স্কুল এবং বাড়ির মধ্যকার সংযোগের বৃদ্ধি ঘটায়।
- ল্যাপটপ এবং ট্যাবসের পোর্টএবিলিটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃসহযোগিতা বাড়ায়।
- এগুলোর ব্যবহার শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি করে থাকে ইত্যাদি।

শ্রেণিকক্ষে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস এর ব্যবহার

শ্রেণিকক্ষে বিভিন্নভাবে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন–

- শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়।

- কোন জটিল বিষয়কে সহজভাবে বুঝানোর জন্য ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহার করে অডিও, ভিডিও, ছবি ইত্যাদি দেখানোর ক্ষেত্রে।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাবিজ্ঞান, বিষয়জ্ঞান এবং প্রযুক্তিজ্ঞানের যথাযথ সমন্বয় ঘটানোর জন্য ল্যাপটপ এবং ট্যাবসব্যবহার করা হয়।
- ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের একক এবং দলীয় কাজ প্রদান করা যায়।
- ব্যবহারিক ক্লাসের ক্ষেত্রে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস এর ব্যবহার অনেক কার্যকরী।
- কোন বিষয়ে উদ্ভুত জটিলতার সমাধানে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহারকারীকে আপডেট তথ্য দেখতে সাহায্য করে।
- শ্রেণিকক্ষে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহারকরে যে কোন বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায় ইত্যাদি।

বাড়ীতে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস এর ব্যবহার

শ্রেণিকক্ষের পাশাপাশি বাড়িতেও শিক্ষার্থীরা ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহার করে তাদের শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারে। যেমন–

- ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়ীর কাজ (Home Work) সম্পন্ন করতে পারে।
- এগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা স্ব-শিখনের জন্য ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহার করতে পারে।
- কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীরভাবে জানার জন্য ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহার করতে পারে।
- ল্যাপটপ এবং ট্যাবসে শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত পাঠ্য বিষয় দেখে আত্মস্ত করতে পারে।
- ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় ডাউনলোড করে নিতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় বিষয় নিজেদের এবং শিক্ষকদের মধ্যে আদান-প্রদান করতে পারে ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিককালে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শ্রেণিকক্ষে এবং বাড়িতে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস অন্যতম প্রদান শিখন উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি কম্পিউটারের আধুনিক সংস্করণ?
   ক. ক্যালকুলেটর
   খ. অ্যাবাকাস
   গ. ল্যাপটপ
   ঘ. কোনটি নয়

২. সহজে বহনযোগ্য কোনটি?
   ক. কম্পিউটার
   খ. ল্যাপটপ
   গ. ট্যাবস
   ঘ. সবকটি

৩. ডেস্কটপের তুলনায় ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহারের সুবিধা নয় কোনটি?
   ক. একের-ভিতরসব
   খ. আকার
   গ. শব্দহীনতা
   ঘ. প্রতিস্থাপন

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহারের উপকারিতা কোনটি?
   ক. আপ-টু-ডেট
   খ. বিনোদন
   গ. কম খরচ
   ঘ. বহুমুখীতা

৫. নিচের কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়িতে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহার করতে পারে?
   ক. মুভি দেখা
   খ. গান করা
   গ. বাড়ির কাজ সম্পন্ন করা
   ঘ. ইন্টারনেট ব্যবহার করা

উত্তরমালা: ১। গ; ২। গ; ৩। ঘ; ৪। ঘ; ৫। গ;

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. ল্যাপটপ কী?
২. ল্যাপটপ এবং ট্যাবসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী?
৩. ল্যাপটপ এবং ট্যাবস এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪. ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহারের উপকারিতা কী কী।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্ষেত্রে ল্যাপটপএবং ট্যাবস ব্যবহারের সুবিধাগুলো বর্ণনা করুন।

২. শ্রেণিকক্ষে যেসব ক্ষেত্রে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত বলে আপনি মনে করেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

৩. শ্রেণিকক্ষের পাশাপাশি বাড়িতেও শিক্ষার্থীরা যেসব ক্ষেত্রে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহার করে তাদের শিখন-শিক্ষন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারেন তা ব্যাখ্যা করুন।

৪. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রেণিকক্ষে ল্যাপটপ এবং ট্যাবস ব্যবহারের চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে লিখুন।

পাঠ ৫.৫: তথ্যভান্ডার ভিত্তিক শিক্ষা প্রশাসন
Databased Educational Adminstration

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- তথ্যভান্ডার কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- তথ্যভান্ডার ভিত্তিক শিক্ষা প্রশাসন কী তা বর্ণনা করতে পারবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবে।
- তথ্যভান্ডার ভিত্তিক শিক্ষা প্রশাসনের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবে।

তথ্যভান্ডার ভিত্তিক শিক্ষা প্রশাসন (Databased Educational adminstration) হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থ্যা যেখানে কম্পিউটারে সফ্টওয়ারের সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, শ্রেণিকরণ এবং দ্রুত ও যথাযথ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসনের সকল কার্যক্রম মানসম্মত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা হয়।

শিক্ষা প্রশাসন এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে মানব সম্পদ এবং অন্যান্য ভৌত সম্পদের সর্বত্তোম প্রাপ্যতা ও ব্যবহারের সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করা হয়। শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন একটি দেশের শিক্ষা প্রশাসন অথবা একটি অঞ্চলের শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষা প্রশাসন থেকে আলাদা। তবে একটি দেশের বা অঞ্চলের শিক্ষা প্রশাসনের ব্যাপ্তি পৃথক হলেও প্রকৃতি একই রকম। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রশাসনে যে সকল বিষয় কাজগুলো করা হয় তা হলো– (ক) পরিকল্পনা; (খ) আয়োজন; (গ) নির্দেশনা; (ঘ) সমন্বয়; (ঙ) পরীবিক্ষণ; (চ) নিয়ন্ত্রণ; (ছ) মূল্যায়ন ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সকল কর্মসম্পাদন করা হয় তা মূলত একই প্রকৃতির হয়ে থাকে যেমন– (ক) শিক্ষার্থী ভর্তি, (খ) শিক্ষাক্রমিক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম, (গ) বিভিন্ন কর্মসূচি প্রনয়ন ও বিতরণ (ঘ) শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন (ঙ) শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মির উপস্থিতির হিসাব ও (চ) বিভিন্ন ফি আদায় ও আর্থিক লেনদেনের হিসাব রক্ষণ ইত্যাদি। কোন দেশের বা কোন অঞ্চলের অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক সকল কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষা প্রশাসককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন প্রকার তথ্য ও উপাত্তের উপর নির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পূর্বে এ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত যথাযথভাবে সংগ্রহ, শ্রেণিকরণ. উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা ছিল বেশ কঠিন। বর্তমানে কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের ফলে তথ্যভান্ডার (Database) তৈরিকরণ ও এর ব্যবহারের ফলে শিক্ষা প্রশাসনে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন ও ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তথ্যভান্ডার (Database) বা ইলেকট্রনিক তথ্যভান্ডার হচ্ছে তথ্য ও উপত্তের একটি বিশেষ প্রকৃতির সমাবেশ যেখানে তথ্য ও উপাত্তসমূহ বিশেষ নিয়মে কম্পিউটারের স্মৃতিভান্ডারে সংরক্ষিত থাকে যা প্রয়োজনে তাৎক্ষনিক পুনরোদ্ধার বা উপস্থাপন করা যায়। তাছাড়া এসকল সংরক্ষিত তথ্য ও উপাত্তসমূহকে প্রযোজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন ও পূনসজ্জিতকরণ এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুছে ফেলা যায়। যে কৌশলে কম্পিউটারে এই তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পূনরোদ্ধার করা হয় তাকে database management system (DBMS) বলা হয়।

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্যভান্ডার ভিত্তিক প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করার জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এসকল পদক্ষেপ যথাযথভাবে প্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্যভান্ডার

ভিত্তিক প্রশাসনিক কাজের জন্য সফ্টওয়্যার পস্তুত করতে হয়। আর এই সফ্টরয়্যার প্রস্তুতের জন্য যে সকল ধাপ অনুসরন করতে হয তা হলো–

প্রথম ধাপঃ প্রথমে প্রতিষ্ঠান যে সকল কাজ বা সেবা এই সফ্টরয়্যার থেকে পেতে আগ্রহী তার তালিকা করতে হবে। যেমন কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত সেবা পেতে আগ্রহী।

- শিক্ষার্থীর ভর্তির আবেদন পত্র গ্রহণ ও ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন।
- শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মীর উপস্থিতির রেকর্ড সংরক্ষণ।
- ক্লাস, পরীক্ষা ও অন্যান্য সময়সূচি প্রচার।
- ভর্তি ফি, কোর্স ফি, পরীক্ষার ফি ও অন্যান্য ফি সংগ্রহ ও হিসাব রক্ষণ।
- গাঠনিক ও প্রন্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ এবং ফলাফল তৈরিকরণ ও প্রকাশ।
- শিক্ষা কার্যক্রম ও অন্যান্য কাজের পরীবিক্ষণ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ধাপঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে তথ্যভান্ডার প্রস্তুত করতে অগ্রহী তা নির্ধারনের পর যে কাজটি করতে হবে তা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে হবে। এজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো প্রস্তুতকরণ। অর্থাৎ কম্পিউটার ও সার্ভারসহ প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া ইন্টারনেট সংযোগ ও প্রতিষ্ঠানের ভিতরে নেটওয়ার্ক তৈরিকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সফ্টরয়্যারে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও আন্যান্য ব্যবহারকারীর এখতিয়ার নির্ধারণ করতে হবে।
- সফ্টওয়্যারে কী কী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে হবে।
- সফ্টরয়্যার প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বাছাইকরণ ও যথাসময়ে সফ্টরয়্যার পাওয়ার জন্য চুক্তিকরণ।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সফ্টরয়্যার প্রস্তুতকারীর প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান।

তৃতীয় ধাপঃ

- সফ্টরয়্যার প্রস্তুত করার পর এটিকে সীমিত আকারে পরীক্ষামূলক ব্যবহার করে অর্থাৎ পাইলটিং এর মাধ্যমে দূর্বলতা চিহ্নিত করে তা দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সফ্টরয়্যার ব্যবহারকারীদের যথাযথ দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

এভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম সফ্টরয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তথ্যভান্ডার ভিত্তিক প্রশাসনিক পদ্ধতি চালু করার প্রস্তুত হয়ে যায়। এই ব্যবস্থা চালু করার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাচের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপত্ত নিয়ে একটি তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে যায়। এবার এই তথ্যভান্ডারের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানটি তথ্যভান্ডার ভিত্তিক প্রশাসনিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে পারবে।

তথ্যভান্ডার ভিত্তিক প্রশাসনিক পদ্ধতিঃ এই পদ্ধতি কার্যকর ও ফলপ্রসুভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সফলতা নির্ভর করছে তিনটি অনুক্রমিক ধাপের উপর। (ক) উচ্চমানের তথ্য উপাত্ত জড়ো করা অর্থাৎ গাঠনিক ও প্রান্তিক মূল্যায়ন,পর্যবেক্ষণ, আর্থিক রেকর্ড ও অন্যান্য বিষয়ের তথ্য ইত্যাদি। (খ) প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ও বৈশিষ্ট্য সূচক ফলাফল তৈরিকরণ। (গ) অতপর বৈশিষ্ট্য সূচক ও সম্পর্কযুক্ত উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে একাডেমিক ও প্রাশাসনিক সিদ্ধান্ত গস্থহণ করতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজেস্ব উদ্যোগে সবসময় সফ্টরয়্যার তৈরিকরণ সম্ভব নাও হতে পারে । এরূপ পরিস্থিতিতে সফ্টরয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে। এরূপ কিছু সফ্টরয়্যার এর উদাহরণ নিচে দেয়া হলো–

সফ্টরয়্যার– ১

সফ্টরয়্যার– ২

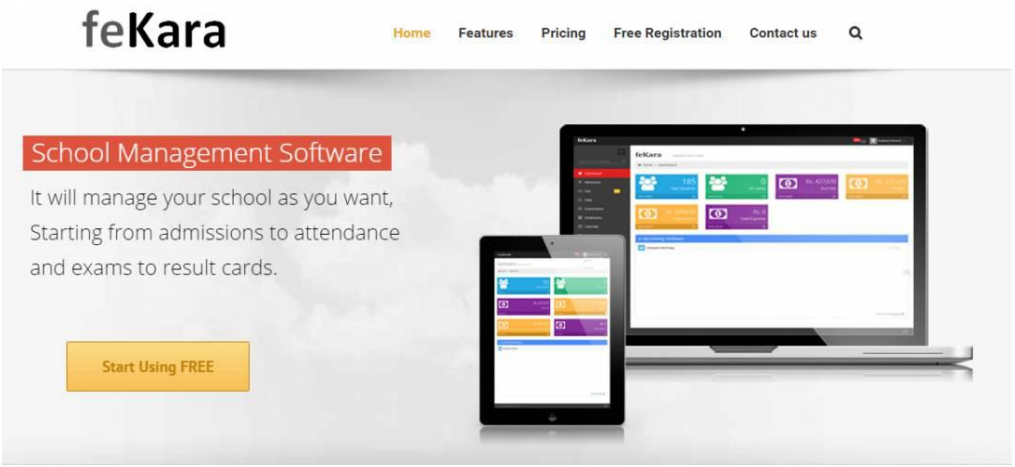

সুবিধাঃ

১. এই পদ্ধতিতে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
২. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির রেকর্ড সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়।
৩. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ও শিক্ষকের দূর্বলতা চিহ্নিত করা যায়।
৪. এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক হিসাব নির্ভুল হয়।

অসুবিধাঃ

১. এই পদ্ধতি তুলনামূলক ব্যয়বহুল।
২. এই পদ্ধতি ব্যবহারে দক্ষ জনবলের অভাব।
৩. শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত নয়।
৪. ইন্টারনেটের গতি কম হওয়ায় এই পদ্ধতিতে কাজ করতে অসুবিধায় হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. কোন তথ্যটির জন্য তথ্যভান্ডার থাকা প্রয়োজন?
ক. বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা
খ. বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা
গ. বিদ্যালয়ের গত দশ বৎসরের ফলাফল
ঘ. বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম

উত্তরমালা: ১। গ

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. তথ্যভান্ডার বলতে কী বোঝায়?
২. তথ্যভান্ডার ভিত্তিক শিক্ষা প্রশাসন বলতে কী বোঝায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবে।
২. তথ্যভান্ডার ভিত্তিক শিক্ষা প্রশাসনের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবে।